নুসাইরিয়া সম্প্রদায়

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. গালেব ইব্‌ন আলি আওয়াজি

অনুবাদ : সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1434

IslamHouse.com

النُصَيرِيَّة

« باللغة البنغالية »

د. غالب بن علي عواجي

ترجمة: ثنا ء الله نذير أحمد

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1434

IslamHouse.com

নুসাইরিয়া সম্প্রদায়

প্রথম অধ্যায়

নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের অনিষ্ট:

কট্টর বাতেনি এক ফেরকার নাম নুসাইরিয়া। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া থেকে তাদের উৎপত্তি। ইসলামি আকিদার অন্যান্য শত্রুদের ন্যায় নুসাইরিয়া সম্প্রদায় মুসলিমদের উপর বিপর্যয় ও অনিষ্টের প্রত্যাশায় লেগে থাকে। মুসলিমদের ক্ষতি করার কোনো সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না। তারা মুসলিমদের উপর নির্দয়ভাবে নির্যাতনকালে বিশ্বাস করে এ জন্য তাদেরকে অধিক সাওয়াব দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে যার ভূমিকা বেশী, তার সওয়াবও বেশী। এটাই তাদের বিশ্বাস। যুগে যুগে মুসলিমদের প্রতি তাদের আচরণ ও বিদ্বেষ থেকে এসব বিষয় স্পষ্ট।

নিকট অতীতে সিরিয়া ও লেবাননে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় তাদের হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যার শিকার নারী, পুরুষ ও শিশু সবাই। অতীতে তারা মুসলিমদের বিপক্ষে ম্যারোনাইট খ্রিস্টান ও খুমাইনী শিয়াদের সাহায্য করেছে। তারাই সাহায্য করেছিল তাতারি ও ক্রুসেডদের, যারা ইসলামি খিলাফত ধ্বংস করেছে, মুসলিম ঐতিহ্য বিনষ্ট করেছে ও মুসলিম নারী-

পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করেছে, ইতিহাসে যার কোনো নজীর নেই। খোদ নুসাইরি লেখকগণ যা স্বীকার করেছেন।

মুসলিম তথা আহলে সুন্নার বিরুদ্ধে যেখানে বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্র দেখা দেয়, সেখানে নুসাইরিয়া সম্প্রদায় মুসলিমদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। নুসাইরিদের ষড়যন্ত্র, হঠকারিতা ও শত্রুদের সাথে আঁতাতের কারণে যে পরিমাণ হত্যা ও সম্ভ্রম হানি ঘটেছে, তা শুনলে শরীর শিউরে উঠে। তাদের সাথে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের রয়েছে গভীর সখ্যতা, আকিদার অনেক মিল। ছয়দিন ব্যাপী আরব-ইসরাইল যুদ্ধ তার স্পষ্ট প্রমাণ।[1] সে যুদ্ধে সিরিয়ার তৎকালিন সেনাপ্রধান আল-আসাদ নুসাইরি ও তার সরকারের ভূমিকা প্রমাণ করে তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ও তাদের পূর্বসূরী আবু বকর, ওমর, উসমান ও অন্যান্যগণ যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে স্বীকৃত তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে যে কারো সাথে হাত মেলাতে প্রস্তুত।

কুফর, নাস্তিকতা ও গোমরাহিতে নুসাইরি সম্প্রদায় এতটাই নিমজ্জিত যে, তাদের অবস্থা দৃষ্টে হিদায়েতের আশা করা কঠিন।

---

[1] এ ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন অনুবাদকের পরিশিষ্ট।

অথচ তাদের দাবি “তারা যাবতীয় কুসংস্কারমুক্ত, সঠিক চিন্তার অধিকারী ও সত্যের অনুসারী”।

প্রিয়পাঠক, তাদের সম্পর্কে জানার জন্য “আল-হাফতুশ শরিফ” কিতাবখানা পড়ুন, যা তাদের বর্তমান যুগের আলেমদের ব্যাপক সম্পাদনা, পর্যালোচনা ও নিরীক্ষার পর মুদ্রিত। আমি আপনাদের সামনে তাদের পবিত্র কিতাব “আল-হাফতুশ শরিফ” থেকে একটি উদাহরণ পেশ করছি, যা থেকে তাদের পথভ্রষ্টতার ধারণা হবে:

“হুসাইন যখন ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল, তখন আল্লাহ তার শরীরে অন্তরীণ হলেন। তিনি যেখানে অবতরণ করেছেন, জিবরীল সেখানে তার নিকট এসেছে ও কথা বলেছে। যখন যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল, বিরোধী সৈন্য তাকে ঘিরে ধরল, ঘোড়াগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়াল ও যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল, তখন আমাদের মাওলা হুসাইন জিবরীলকে ডেকে বলেন: হে ভাই![1] আমি কে? তিনি বললেন: আপনি আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চিরজাগ্রত, জীবন-মৃত্যুর মালিক। আপনি আসমানকে নির্দেশ করেন, ফলে সে আপনার আনুগত্য করে। আপনার নির্দেশে জমিন স্থির দাঁড়ায়, পাহাড় আপনার ডাকে সাড়া দেয়, সমুদ্রসমূহ আপনার আনুগত্যে দ্রুত ছুটে আসে। আপনি সে

---

[1] লক্ষ্য করুন হুসাইনের শরীরে অন্তরীণ আল্লাহ জিবরীলকে ভাই বলে সম্বোধন করছে!

সত্তা, যার নিকট ষড়যন্ত্রকারীর ষড়যন্ত্র ও অনিষ্টকারীর অনিষ্ট পৌঁছুতে পারে না"।

"আল-হাফতুশ শরিফের" গ্রন্থকার অন্যত্র বলেন: জিবরীল উমাইয়্যাদের সেনাপ্রধান সাদ ইবনে ওমরকে লক্ষ্য করে বলেন: "তুমি ধ্বংস হও, তুমি দু'জাহানের রব, পূর্বাপর সকল মাখলুকের রব, আসমান-জমিন ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর স্রষ্টাকে হত্যা করছ? ওমর ইবনে সাদ এ ঘোষণা শোনে ভয়ে কম্পিত হয়"।[1] এ জাতীয় আরো অনেক বেহুদা আলোচনা রয়েছে, যা তাদের বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ।

"আল-হাফতুশ শরিফের" লেখক ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে গাল-মন্দ করে বলেন: তিনি হুসাইনের যুগে পুনর্জন্ম বিধান মতে ভেড়ার আকৃতিতে ছিলেন, আল্লাহ ফিদিয়া হিসেবে হুসাইনকে তা প্রদান করেন। তিনি ওমরকে জবাই করেন, যার নাম ছিল "দালামাহ" বা "আদলামা"। তিনি মুফাদ্দাল থেকে বর্ণনা করেন, সাদেক তাকে বলেছেন: "হে মুফাদ্দাল, যে ভেড়াটি হুসাইনকে ফিদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছিল, তার নাম আদলাম, কুরাইশদের আদলাম। ওমর তখন বৃদ্ধাবস্থায় ভেড়ার আকৃতিতে ছিল"। অতঃপর তিনি বলেন: তার শিং দু'টি কাবার সাথে ঝুলন্ত রয়েছে।

---

[1] "আল-হাফতুশ শরিফ": (৯৬-১০২) পড়ুন, আরো আশ্চর্য বিষয় পাবেন।

“হে মুফাদ্দাল, বায়তুল হারামে ঝুলন্ত শিং দু’টি তুমি দেখনি? আমি বললাম: হ্যাঁ, হে আমার মনিব। তিনি বললেন: শিং দু’টি ভেড়ার, যা হুসাইনকে ফিদিয়া হিসেবে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর সাদেক হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। আমি বললাম: হে আমার মাওলা, হাসলেন কেন? তিনি বললেন: হে মুফাদ্দাল, মানুষেরা যখন হজের মৌসুমে মক্কায় সমবেত হয়, তারা ভেড়ার শিং দু’টি উৎসুক হয়ে দেখে, তারা ভাবে এগুলো জান্নাত থেকে এসেছে, তাই আশ্চর্যের দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকায়। আর আমরা সেদিকে তাকাই এ হিসেবে যে, এ শিং দু’টি “দালামার”। বস্তু একই, মানুষেরা আশ্চর্য হয় এক হিসেবে, আমরা আশ্চর্য হই অন্য হিসেবে”।[1]

প্রিয়পাঠক, এ অগ্নিপূজক কাবায় ঝুলন্ত দু’টি শিং কোথায়, কিভাবে ও কখন দেখেছে আমরা জানি না, জানি না এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য কি। সেখানে আমরা কখনো কোনো শিং দেখিনি, কেউ বর্ণনাও করেনি কাবায় দু’টি শিং রয়েছে।

বর্তমান কালেও (হাফেয আল-আসাদ এর সময়) একবার নুসাইরিয়া সম্প্রদায় হামা শহরে তাদের সেনাবাহিনী নিয়ে যে শ্লোগান নিয়ে হামা শহরের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে বলছিল, তা কখনও হামার অধিবাসীরা ভুলতে পারবে না, তারা

[1] “আল-হাফতুশ শরিফ”: (৯৪)

বলছিল, “নাও অস্ত্র, ধর অস্ত্র, মুহাম্মাদের দ্বীন পশ্চাতে ও তিরোহিত”[1]।

[1] আল-ইসলাম ফী মুওয়াজিহাতিল বাতিনিয়্যাহ, পৃ. ১১০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইরি কর্তৃক শিয়া মতবাদ ত্যাগ করার কারণ ও তার ব্যাপারে শিয়াদের মন্তব্য:

নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের সূচনা মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইর আন-নুমাইরি থেকে। তার উপনাম আবু শু‘আইব। সে ছিল শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া মতবাদের অনুসারী ও পারস্যের অধিবাসী। একসময় “বাবের” দাবিতে শিয়াদের সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়, ফলে সে তাদের ত্যাগ করে। তার দাবি: তিনি প্রতীক্ষার মাহদি মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আল-আসকারির “বাব” (দরজা) ও মানুষের নিকট তার উকিল বা প্রতিনিধি। কিন্তু ইমামিয়্যাগণ তার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে, তাই সে তাদের ত্যাগ করে স্বীয় অনুসারীদের নিয়ে আলাদা দল গঠন করে এবং ২৬০হি. মতান্তরে ২৭০হি.-তে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে দলের নেতৃত্ব দেন। ফির্কা গবেষকগণ বলেছেন: তিনি শিয়া ইমামিয়াদের এগারতম ইমাম হাসান আসকারির মাওলা বা দাস ছিল, কিন্তু হাসান আসকারি তার ও তার ভ্রান্ত কুফরি মতবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইরি স্ব সৃষ্ট নুসাইরি মতবাদের প্রত্যেক শাখা শির্ক ও নাস্তিকতায় ভরে দেন। তার মতবাদের মূল মন্ত্র দুর্বোদ্ধ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, যারা দ্বারা সে মানুষদেরকে তার ধর্ম ও

বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান করে। তার ধর্মের উপর গবেষণা ও তাদের সংশ্রব ব্যতীত যার অর্থ জানা অসম্ভব। এ জাতীয় একটি উদাহরণ [অনুবাদ করে] পেশ করছি:

“আমি, মহান আলি ও মাজহারে আসনা[1] সম্পর্কে যা বিশ্বাস করি তার শপথ। নূর ও তার থেকে যা সৃষ্টি হয় তার শপথ, মেঘ ও তাতে অবস্থানকারীর শপথ, অন্যথায় আমি সম্পর্ক ছিন্ন করব মহান আলির থেকে, তাকে সমর্থন থেকে ও সত্য বিকশিত হওয়ার বাহ্যিক সত্তা থেকে। আমি অনুমতি ছাড়া সালমানের পর্দা উন্মুক্ত করেছি, হুজ্জত ইব্‌ন নুসাইরির দাওয়াত থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করছি। আমি ইব্‌ন মুলজিমকে লা'নতকারীদের দলে প্রবেশ করেছি। আমি খাত্তাবকে অস্বীকার করছি, -অর্থাৎ তার দীন ও দাওয়াত-, আমি সংরক্ষিত রহস্য প্রকাশ করে দিয়েছি ও আহলে হকের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছি, অন্যথায় আমি আমার হাতে আঙ্গুর গাছের কাণ্ড জমিন থেকে উপড়ে ফেলব, যেন মূলসহ তা উঠে যায়। আমি তার প্রাপ্তির স্থান নিঃশেষ করে দেব। আমি হাবিলের বিপক্ষে কাবিলের সাথে ও ইবরাহিমের বিপক্ষে

---

[1] “মাজহারে আসনা” অর্থ দীপ্তিময় ও উজ্জ্বল বাহ্যিক রূপ, অবয়ব বা দৃশ্য। খুব সম্ভব এখানে উদ্দেশ্য আলি ইব্‌ন আবু তালিব, কারণ তাদের বিশ্বাস আল্লাহ আলি ইব্‌ন আবু তালিবের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন। তাই তারা তাকে মাজহারে আসনা বা দীপ্তিময় অবয়ব বলে। অনুবাদক।

নমরুদের সাথে। এভাবে প্রত্যেক ফিরাউনের পক্ষ নিব, যতক্ষণ না আমি মহান আলির সাথে সাক্ষাত করব, আমার উপর তার অসন্তুষ্টি নিয়ে। আমি কুন্বুরের কথা থেকে বিচ্ছিন্ন, আর বলব যে, সে আগুনের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম হয়নি"।[1] আমাদের আগামি আলোচনা থেকে এসব কসমের অর্থ স্পষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

'হাসান আসকারি'কে সম্পৃক্ত করে ইব্ন নুসাইর স্বীয় দীনের ঘোষণা দিয়ে বলল: আমি হাসান আসকারির ছেলে মুহাম্মদ ইব্ন হাসান আসকারির "বাব"। এতে হাসান আসকারি তার প্রতি ক্ষুব্ধ হন ও অনুসারীদেরকে তার থেকে সতর্ক করেন। ইব্ন নুসাইর ও তার ভ্রান্ত মতবাদ থেকে সতর্ক করে এক অনুসারীকে লেখা তার একটি পত্র:

"আমি ইব্ন নুসাইর আন-নুমাইরি ও ইব্ন বাবা আল-কুম্মির সাথে আল্লাহর নিকট বিচ্ছেদ ঘোষণা করছি, আমি তাদের উভয় থেকে বিচ্ছিন্ন। আমি তোমাকে ও আমার সকল অনুসারীকে সতর্ক করছি, আর তোমাকে বলছি যে, আমি তাদের উভয়ের উপর লা'নত করছি। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, তারা ফেতনা

---

[1] "আল-আলাবিউন আও আন-নুসাইরিয়্যাহ": (পৃ.৩), এসব বাক্যে আলির প্রতি তাদের ক্ষোভ স্পষ্ট হয়। আলির প্রতি তাদের ক্ষোভ সম্ভবত এ জন্য যে, যারা তাকে ইলাহ জ্ঞান করেছে, তিনি তাদের জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

সৃষ্টিকারী ও কষ্টদাতা। আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট দিন, তাদের উপর লা‘নত করুন ও ফেতনায় তাদের নিমজ্জিত রাখুন”।[1]

হাসান আসকারী কর্তৃক তাকে লা‘নত করার কারণ:

ইব্‌ন নুসাইর আহলে বাইতের জন্য উলুহিয়্যাত ও নিজের জন্য নবুওয়ত দাবি করে অগ্নিপূজক মূর্তিপূজকদের নীতির উপর স্বীয় ধর্ম ঘোষণা দেন, তাই হাসান আসকারি তার উপর লা‘নত করেন। আব্দুল হুসাইন ‘আল-কুম্মি’র সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইরির স্বভাব সম্পর্কে বলেন: সে ছিল নির্লজ্জ ও সমকামি। সে সমকামিতা ও অন্যান্য হারাম বস্তু বৈধ ঘোষণা করেছিল, তার দাবিতে এগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে বিনয় ও নমনীয়তার আলামত... আরো অনেক কিছু,[2] আমরা এখানে তার উদ্ধৃতি পছন্দ করছি না।

অবশ্য “আল-হাফতুশ শরিফে” এসব অস্বীকার করে বলা হয়েছে কোনো মুমিন থেকে এ জাতীয় কর্মকাণ্ড প্রকাশ পেতে পারে না, বরং তার পক্ষেই সম্ভব, যে আলির সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে। মুফাদ্দাল এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শিয়াদের সব কিতাবে রয়েছে: ইব্‌ন নুসাইর প্রথমে “বাব”, অতঃপর নবুওয়ত, অতঃপর

---

[1] “আল-আলাবিউন আও আন-নুসাইরিয়্যাহ”: (পৃ.৪),

[2] “আল-আলাবিউন আও আন-নুসাইরিয়্যাহ”: (পৃ.২১), মাকালাতুল কুম্মি থেকে সংকলিত: (পৃ.১০০)

আলির উলুহিয়্যাত দাবি করে। হারাম হালাল করে ও পুর্নজন্ম তথ্য পেশ করে। শিয়া আব্দুল হুসাইন স্বীয় রচনা "আল-আলাবিউন আও আন-নুসাইরিয়্যাহ" গ্রন্থে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন শিয়াদের প্রথিতযশা লেখকদের লিখনি থেকে, যেমন সাদ আল-কুম্মি,[1] আন-নওবখতি,[2] আবু ওমর আল-কাশি,[3] আবু জাফর আত-তুসি,[4] আল-হিল্লি,[5] আত-তাবরাসি[6] ও ড. মুস্তফা আশ-শায়বি[7] প্রমুখ।

অতঃপর আব্দুল হুসাইন নুসাইরিয়া সম্প্রদায়, ইব্‌ন নুসাইর ও তার সকল চিন্তা-বিশ্বাস থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেন, যদিও শিয়াদের কিতাবে হাসান আসকারির সাথে নুসাইরির সম্পর্কের প্রমাণ রয়েছে।[8] হাসান আল-আসকারির মৃত্যুর পর

---

[1] "আল-মাকালাত ওয়াল ফেরাক"

[2] "ফেরাকুশ শিয়া"।

[3] "রিজালুল কাশি"।

[4] "রিজালুত তুসি" ও "কিতাবুল গাইবাহ"।

[5] "আর-রিজাল"।

[6] "আল-ইহতেজাজ"।

[7] الصلة بين التصوف والتشيع

[8] হাসান আসকারি শিয়াদের দ্বাদশ ইমাম, তাই তার শিষ্য বা দাস থেকে কোনো শিয়ার বিচ্ছেদ ঘোষণা করা তাদের ইমান পরিপন্থী বিষয়। শিয়াদের প্রামাণ্য গ্রন্থে ইব্‌ন নুসাইরি এর সাথে হাসান আসকারির সম্পর্কের উল্লেখ

ইবন নুসাইরি তার (তথাকথিত) ছেলে দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদের সকল 'উকিল' বা প্রতিনিধি অস্বীকার করে নিজেকে "বাব" দাবি করেন।[1] এ জন্য রাফেযিরা (বর্তমান ইরানী শিয়ারা, যারা নিজেদেরকে জা'ফরী বলে থাকে, তারা) তার থেকে প্রতিশোধ নেয় ও তার উপর নানা অপবাদ আরোপ করে।

শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া মতবাদে বিশ্বাসী মুহাম্মদ রেযা শামসুদ্দিন নিশ্চিত করে বলেন, যিনি ১৩৭৬হি.-তে নুসাইরিদের জানার জন্য নাজাফের আবদুল হাদী আশ-শীরাযী নামীয় জনৈক আলেমের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে সেখানে যান ও তাদের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বলেন: "নুসাইরিরা এখনো তাদের নেতা মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইরির মতবাদ আঁকড়ে আছে। তিনি বলেন: যখন তিনি সেখানে পৌঁছেন, তারা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তিনি তাদের মধ্যে সালাত, হজ ও ইসলামি অন্যান্য ফরয ইবাদতের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখেন নি, তাদের অঞ্চলে কোনো মসজিদ নেই।

থাকা সত্ত্বেও আব্দুল হুসাইন তার থেকে বিচ্ছেদ ঘোষণা করে তাই করলেন। [অনুবাদক]

[1] শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়াদের দাবি, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আল-আসকারির গুহায় আত্মগোপনের পর মানুষের প্রতি তার চারজন উকিল বা প্রতিনিধি হয়েছিল: উসমান ইব্‌ন সায়্যেদ আল-উমরি, মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান আল-খাল্লানি, হুসাইন ইব্‌ন রূহ আন-নওবখতি ও আলি ইব্‌ন মুহাম্মদ আস-সামরি।

তিনি লক্ষ্য করেন তারা ব্যাপকভাবে পুর্নজন্মে বিশ্বাসী, এটাকে তারা রূহের পোশাক পরির্বতন বলে”।[1]

মুহাম্মদ রেযার সাক্ষী সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তিনি তাদের সম্পর্কে বেশী জানেন, “আর তাদের নিজেদের লোক সাক্ষ্য দিল”। অতএব সালাত, হজ ও মসজিদ নির্মানের বিরোধিতা করে তারা কোন্ ইসলামের দাবি করে! পুর্নজন্ম আকিদা তো আছেই; যা মূলত অগ্নিউপাসকদের আকীদা-বিশ্বাস। তবুও আহলে সুন্নাহ তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে বে-খবর।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইদানিং শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া সম্প্রদায় (ইরানী শিয়ারা যারা নিজেদেরকে জা‘ফরী বলে থাকে) তারা নুসাইরিয়া ফেরকাসহ কঠিনভাবে বিভ্রান্ত বাতেনি সকল ফেরকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে, উদ্দেশ্য [আহলে সুন্নার বিরুদ্ধে][2] দ্বাদশ ইমামিয়া মতবাদের উপর সবাইকে এক কাতারে সমবেত করা। এর অংশ হিসেবে তারা ঘোষণা দিয়েছে নুসাইরি [আলাবি] সম্প্রদায় আহলে বাইতের অনুসারী। শিয়া আব্দুল হাদি সিরাজি

---

[1] দেখুন তার লেখা গ্রন্থ: “আল-আলাবিউন ফি সুরিয়া”: (পৃ.৫৪), “আল-আলাবিউন আও আন-নুসাইরিয়া”: (পৃ.৪৬)

[2] ব্রাকেটের অংশ অনুবাদকের পক্ষ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।[1] বর্তমান যুগে রাফেজিদের (ইরানী শিয়াদের) পাশে আলাবিদের (নুসাইরিয়াদের) দাঁড়ানো তার বড় প্রমাণ[2]।

তৃতীয় অধ্যায়

নুসাইরিদের বিভিন্ন নাম ও নাকরণের কারণ:

নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নাম রয়েছে, যার কতিপয় তারা পছন্দ করে, কতিপয় অপছন্দ করে, যেমন:

১- "আন-নুসাইরিয়া":

এ নাম তাদের অন্যান্য নামকে ছাপিয়ে গেছে। এ নামে তারা অধিক প্রসিদ্ধ, কিন্তু এটা তারা মোটেই পছন্দ করে না, বরং এ নামের কারণে তারা নিজেদের হেয় মনে করে। এ নাম অপছন্দ করার কারণসমূহ:

---

[1] দেখুন আব্দুল হাদি সিরাজি লিখিত: "আলাবিউন শিয়াতু আহলিল বাইত"।

[2] আমার উস্তাদজী ড. গালেব যখন গ্রন্থখানি লিখেন তখনকার অবস্থা এটি ছিল, আমরা এখনও দেখছি যে, ইরানী শিয়ারা বর্তমান সিরিয়ার শাসক বাশশার আল-আসাদ নুসাইরী, যাকে তারা আলাওয়ী বলে থাকে, তার পক্ষ নিয়ে সিরিয়ার সুন্নী মুসলিমদের নিধনে সহযোগিতা করছে। [সম্পাদক]

প্রথম কারণ: তাদের ধারণা বিরোধিরা ধর্মীয় গোড়ামী, শত্রুতা ও সংকীর্ণতা থেকে তাদেরকে কোণঠাসা করার জন্য এ নাম তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ: তাদের ধারণা তুর্কীরা যখন সিরিয়া শাসন করছিল, তখন নুসাইর নামক যে পাহাড়ে তারা বসবাস করত, তার সাথে সম্পৃক্ত করে তারা তাদেরকে নুসাইরি বলে। উদ্দেশ্য তাদের থেকে বদলা নেয়া ও তাদেরকে হেয় করা। অতঃপর ফরাসিরা সিরিয়া দখল করে তাদের উপর 'আলাবি' নামের প্রয়োগ করে, যা তাদের খুব পছন্দ হয়।[1] এ জন্য নুসাইরিরা ফরাসিদের সম্মান করে ও বন্ধুভাবে। ফরাসিরা এক প্রজ্ঞাপন জারি করে নুসাইরি পাহাড়ের নাম পরিবর্তন করে আলাবি অঞ্চল নাম রাখে।

প্রাচ্যবিদ "রেসু" থেকে তাদের নুসাইরি বলার আরেকটি কারণ জানা যায়। তিনি বলেন: নাসারা বা নাসরানির সাথে সামঞ্জস্যতার কারণে তাদেরকে নুসাইরি বলা হয়। তার এ মন্তব্যের কারণ খুব সম্ভব নুসাইরি ও নাসারা উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রথা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মিল, নাসারাদের ধর্মীয় উৎসবসমূহে তাদের যোগদান করা, উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক মদকে সম্মান করা ও মুসিবতের সময় একে অপরের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি। লেবাননের বর্তমান ঘটনাগুলো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

---

[1] সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা আসছে।

তবে নাসারা ও নুসাইরির মধ্যে মিল রয়েছে সন্দেহ নেই, তবে অধিকতর যৌক্তিক হল এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আবু শু'আইব, মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইর আল-বসরি, আন-নুমাইরির নামে তাদের নামকরণ করা হয়েছে।[1]

আব্দুল হুসাইন এসব কারণের সাথে অপর একটি কারণ উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে নুসাইরিদের উপর ঘৃণা, দুর্নাম ও নাস্তিকতার ছাপ রয়েছে। তাই তারা একে ঢেকে দিতে চায়।[2]

প্রাচ্যবিদ "রেসু" তাদের নুসাইরি নামকরণের পশ্চাতে যা বলেছেন, ড. হাসান ইবরাহিম হাসান এর মন্তব্য তার যথার্থতা প্রমাণ করে। তিনি বলেন:

"তাদেরকে নুসাইরি বলার ভিন্ন একটি কারণ রয়েছে, যা তাদের পাশে বসবাসকারী সুন্নিদের নিকট প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ তাদের নামের সাথে নাসরানি বা নাসারা শব্দের মিল। বিভিন্ন সময়ে তাদের দ্বারা নাসারাদের অনুষ্ঠানসমূহ পালন, যেমন নাসারাদের মত তাদের রয়েছে জন্ম উৎসব ও ইস্টার উৎসব ইত্যাদি, এমনকি তারা এটাকে তাদের সর্ববৃহৎ উৎসবের অন্যতম হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তাদের কেউ কেউ নাসারাদের নামে নিজেদের নাম রাখে, যেমন মাত্তা (মথি), ইউহোন্না (যোহন) ও হীলানা, ইত্যাদি।

---

[1] "তায়েফাতুন নুসাইরিয়্যাহ": (পৃ.২৪)

[2] "আল-আলাবিউন": (পৃ.৮)

অধিকন্তু নাসারাদের থেকে নেয়া নুসাইরিদের মৌলিক নীতির সংখ্যাও কম নয়। তাদের ধর্মীয় বিষয়গুলো রহস্যাবৃত। কতিপয় নিদর্শন রয়েছে রহস্যে ঘেরা শিরোনাম সর্বস্ব, যার একটির সাথে অপরটির কোনো মিল নেই। তবে সবগুলোর সাথে নক্ষত্র ও গ্রহ পূজার পুরোপুরি মিল রয়েছে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এসব শিক্ষা রূহানী শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হত। খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের ন্যায় এক সত্তা তিন সত্তার মধ্যে দেহধারণ করার মতবাদ নুসাইরিদের ধর্মে রয়েছে। তারা মনে করে এ তিন সত্তা মূলত এক সত্তা ও চিরস্থায়ী।

নুসাইরিদের তিন সত্তার নীতি খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের সমতুল্য। তারা তিন সত্তার জন্য তিনটি শব্দ ব্যবহার করে, যথা: (ع.م.س) তারা বলে: এ তিন সত্তার মধ্যে আল্লাহ দেহধারণ করেছেন।[1]

এক. আলি, তার জন্য তারা (المعنى) শব্দ ব্যবহার করে।

দুই. মুহাম্মদ, তার জন্য তারা (الاسم) শব্দ ব্যবহার করে।

তিন. সালমান, তার জন্য তারা (الباب) শব্দ ব্যবহার করে।[2]

---

[1] ع দ্বারা আলি, م দ্বারা মুহাম্মদ ও س দ্বারা সালমান ফারসি উদ্দেশ্য। অনুবাদক।

[2] হাসান ইবরাহীম হাসান, "তারিখুল ইসলাম, আস-সিয়াসি, ওয়াদ দীনি, ওয়াস সাকাফি, ওয়াল ইজতেমায়ি": (পৃ.৪/২৬৫, ২৬৭), দেখুন: আল-আলাবিউন: (পৃ.৫৪,৫৫)

এখানে উল্লেখ্য যে, নুসাইরিরা নুসাইরি নামের কারণে বিরক্তি বোধ করে, কিন্তু তাদের পরবর্তী কতিপয় পণ্ডিত যখন দেখলেন মানুষেরা তাদের উপর এ নামই প্রয়োগ করছে, তাই এর নতুন ব্যাখ্যা তারা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন, যা তাদের পছন্দনীয়।

নুসাইরি আমিন গালেব আত-তাবিল নুসাইরি শব্দের এমনি এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন সাহাবি আবু উবাইদাহ ইব্‌নুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যখন শামে জিহাদ করছিলেন, তখন তিনি সাহায্য তলব করেন, ফলে ইরাক থেকে খালেদ ইব্‌ন ওয়ালিদ, মিসর থেকে আমর ইব্‌নুল আস ও মদিনা থেকে আলাবিদের বিরাট এক অংশ এসে তার সাথে যোগ দেয়, যারা "গাদিরে খুম"-এ বাইয়াত করেছিল। তারা সবাই আনসারি ছিল, তাদের সংখ্যা ৪৫০-জন মুজাহিদ।

মদিনার এ বাহিনী সৈন্যদের সাথে মিলিত হলে আংশিক সাফল্য লাভ হয়, যার নাম দেয়া হয় নুসাইরাহ্। অতঃপর বিজিত জমি যুদ্ধের নিয়মানুযায়ী তাদের মাঝে বণ্টন করা হয়, যার নাম বর্তমান নুসাইরিয়া পাহাড়। অতঃপর লেবানন থেকে তুরস্কের এন্টাকিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ে বসবাসকারী প্রত্যেকের নাম হয় নুসাইরি।[1]

[1] তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ: (পৃ.৩৫)

কয়েকটি কারণে এ ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক মূলহীন। সবচেয়ে বড় কথা ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর যুগে এ নামের অস্তিত্বই ছিল না। দ্বিতীয়ত মদিনা থেকে আগত ছোট্ট এক জামাতের দিকে বিজয়কে সম্পৃক্ত করে অন্যদের অবজ্ঞা করার নীতি মুসলিমদের মধ্যে ছিল না। তৃতীয়ত সাহাবিদের পক্ষে ভাবা অসম্ভব যে, তারা জিহাদের জন্য এসে জিহাদ ত্যাগ করে নুসাইরি পাহাড়ে আবাসস্থল গড়ে তৃপ্ত হবেন।

অধিকন্তু খুলাফায়ে রাশেদার যুগে ‘আলাবি’ নামে কোন দল ছিল না। খারেজি ও শিয়াদের জন্ম হয় আলি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর যুগে, অন্যান্য বাতিল ফেরকার সূচনা হয় আলি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর খিলাফতের শেষ দিকে, আর নুসাইরিদের জন্ম তৃতীয় হিজরিতে।

আমিন গালিব মত হচ্ছে যে, ‘মদিনা থেকে আগত সবাই গাদিরে খুমে উপস্থিত ছিল।’ এর উত্তরে বলা যায় যে, গাদিরে খুমে উপস্থিত সাহাবিদের খিলাফতে রাশেদা তথা আবু বকর থেকে আলি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম-এর যুগ পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোনো মর্যাদা ছিল না। বরং তাদের দিকে সাধারণ অন্যান্য মুসলিমদের মতই দৃষ্টি দেওয়া হতো।

তথাপি এ ব্যাখ্যা দ্বারা তারা তাদের পূর্বপুরুষ অন্যান্য শিয়াদের উপর মিথ্যারোপ করলে, যাদের নিকট গাদিরে খুমে উপস্থিত সাহাবির অল্প ক’জন ব্যতীত সবাই মুরতাদ হয়ে গেছে। কারণ

তারা (তাদের মত অনুযায়ী) নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্বাচিত আলির হাতে খিলাফতের বাই‘আত গ্রহণ করে নি।

২. “আলাবি”:

আলাবি নুসাইরিদের পছন্দনীয় নাম। তারা এ নাম খুব পছন্দ করে, তারা চায় সবাই তাদের এ নামে ডাকুক, অন্য নাম ভুলে যাক।

কতক আলেম এ নাম সম্পর্কে বলেন: তারা আলি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ইবাদত করে ও তাকে ইলাহ হিসেবে জানে, তাই তাদেরকে ‘আলাবি’ বলা হয়। বস্তুত তাদের নাস্তিকতা থেকে আলি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মুক্ত ও পবিত্র, যেমন পবিত্র জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ জাফরিয়া মাযহাব থেকে।

এ নাম পছন্দ করার কারণ হিসেবে আব্দুল হুসাইন বলেন: “নুসাইরিয়া নামের কারণে তাদের উপর যে ঘৃণা, দুর্নাম ও নাস্তিকতার প্রলেপ পড়েছে, এ নাম তা থেকে তাদেরকে নাজাত দেয়, তাই তারা এ নাম খুব পছন্দ করে। দ্বিতীয়ত এ নামের আড়ালে তারা শিয়াদের কাছে আসার সুযোগ পায়”। অতঃপর বলেন: “এতে সন্দেহ নেই, যেভাবেই হোক ইমাম আলির সাথে

তাদের সম্পর্ক ইবনে নুসাইরির সাথে সম্পর্কের চেয়ে অনেক ভালো”।[1]

৩. “সূরাহ্ কা”:

তুর্কীরা তাদের উপর এ নাম প্রয়োগ করে। সময়ের বিবর্তনে মানুষ তা “সুরাক” বলে। তুর্কীদের ভাষায় যার অর্থ নির্বাসিত বা বিতাড়িত। ড. সুলাইমান আল-হালবির তথ্য মতে বর্তমান যুগে আলেপ্পো, সাহয়ূন, উমরানিয়া ও সাফিয়াতা[2] ইত্যাদি অঞ্চলে তাদেরকে এ ‘সুরাক’ নামে ডাকা হয়।[3]

ড. গালেব বলেন, আমি অনেক তুর্কীকে “সুরাক” শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউ বলতে পারে নি। হয়তো এটা তুর্কীদের পুরনো ভাষা ছিল, পরবর্তীতে ত্যাগ করা হয়েছে।

৪. নুমাইরিয়া:

নুসাইরিদের অপর নাম নুমাইরিয়া। মুহাম্মদ ইব্ন নুসাইর আন-নুমাইরির নামে তাদেরকে নুমাইরি বলা হয়। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে

---

[1] “আল-আলাবি”: (পৃ.৩২)

[2] বর্তমান যুগে আলেপ্পো সিরিয়ায়, সাহয়ূন ইসরাইলে, উমরানিয়া মিসরের জিযা জেলায় ও সাফিয়াতা সিরিয়ার তরতুস জেলায় অবস্থিত। অনুবাদক।

[3] “তারিখুল আলাবি”: (পৃ.৩৪২), “তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ”: (পৃ.৩৫)

তারা অন্যান্য নামেও পরিচিত, যেমন পশ্চিম আনাটোলিয়ায়[1] “তাখতাজিয়্যাহ” বা “আল-হাত্তাবুন” এবং ইরান, তুর্কীস্তান ও কুর্দিস্তানে “আলি ইলাহিয়্যাহ” নামে পরিচিত”।[2]

---

[1] বর্তমান তুরস্কের অধীন। উত্তরে কালো সমুদ্র, উত্তর পশ্চিমে জর্জিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে সিরিয়া, দক্ষিণ-পূর্বে ইরাক ও পূর্বে ইরান। অনুবাদক।

[2] “আল-আলাবি”: (পৃ.৩১)

চতুর্থ অধ্যায়

নুসাইরিদের উদ্ভব:

শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়াদের একাদশ ইমাম হাসান আসকারির নিঃসন্তান মৃত্যু তাদের মধ্যে কঠিন বিরোধের জন্ম দেয়। তার মৃত্যুর পর শিয়ারা প্রায় ১৪-টি ফেরকায় বিভক্ত হয়, কেউ মুহাম্মদ নামে হাসান আসকারির সন্তান স্বীকার করেন, কেউ তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

শিয়াদের ধারণা "কোন যুগ ইমাম বিহীন থাকা সম্ভব নয়, যিনি মানুষের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রন করেন, অন্যথায় মানুষের জীবন অচল হতে বাধ্য"।[1] [এ হিসেবে তারা বলে অবশ্যই হাসান

---

[1] শিয়াদের একাদশ ইমাম হাসান আসকারির নিঃসন্তান মারা যাওয়ার কারণে ইমামিয়া আকিদা চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। কারণ তাদের বিশ্বাস প্রত্যেক যুগে অবশ্যই ইমাম থাকা জরুরি, যিনি মানুষের যাবতীয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, অন্যথায় মানবিক জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। রাজতন্ত্রের ন্যায় ইমামের ছেলে ইমাম হবেন, অন্য কেউ নয়। তাই হাসান আসকারির নিঃসন্তান মৃত্যু পরবর্তী অনাকাঙ্খিত বাস্তবতার সামনে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাসান আসকারির ছেলে ধারণা করে নেন, যার নাম মুহাম্মদ, যেহেতু বাস্তবে ছিল না, তাই তারা বলেন জন্মের পরই সে গর্তে বা সমাধিগৃহে আশ্রয় নিয়েছে। অপর দল বাস্তবতা মেনে নিয়ে তার সন্তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এভাবে তাদের মধ্যে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়। [অনুবাদক]।

আসকারির সন্তান ছিল, তবে জন্মের পরে তিনি সমাধিগৃহে আশ্রয় নেন][1] দ্বাদশ ইমাম যেহেতু বাহ্যিক ছিলেন না, তাই তারা “বাব” এর থিউরি উদ্ভাবন করেন। “বাব” আহলে বাইতের খাস ব্যক্তি, তিনি অদৃশ্য ইমাম ও মানুষের মাঝে মধ্যস্থতা করেন।

এ কুসংস্কারের জন্য তারা একটি জাল হাদিস পেশ করে। তাদের ধারণায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

((من طلب العلم فعليه بالباب)، (أنا مدينة العلم وعلي بابها).

“যে ইলম অন্বেষণ করে, সে যেন অবশ্যই বাবকে আঁকড়ে ধরে। আমি ইলমের শহর আর আলি তার বাব”[2]। এ থেকে তারা ইমাম নির্বাচনের সাথে “বাব”ও নির্বাচন করে। প্রথম “বাব” আলি ইব্‌ন আবু তালিব, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের “বাব” ছিলেন। দ্বিতীয় “বাব” সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, তিনি আলি ইব্‌ন আবু তালিবের “বাব” ছিলেন। এভাবে তারা একাদশ ইমাম হাসান আসকারি পর্যন্ত “বাব” নির্ধারণ করে। অতঃপর দ্বাদশ ইমামের “বাব” নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

---

[1] অনুবাদক।

[2] এটি নিঃসন্দেহে একটি বানোয়াট হাদীস। ‘বাব’ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে, দরজা, দ্বার, ফটক ইত্যাদি। সে হিসেবে তাদের নিকট সরাসরি ইমামের কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই, বাব এর কাছে যেতে হবে, তিনি ইমামের কাছ থেকে জেনে লোকদেরকে জানাবেন। [সম্পাদক]

নুসাইরিদের দাবি দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌নুল হাসান আসকারির কোন "বাব" ছিল না,[1] বরং "বাবের" ধারাটি একাদশ ইমাম হাসান আসকারি পর্যন্ত চলমান ছিল, অর্থাৎ তার বাব ছিলেন আবু শুআইব মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইর। এ থেকে নুসাইরিয়া ও দ্বাদশ ইমামিয়ার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।[2] তাই মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইর ও তার দল শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়া থেকে বের হয়ে যায়।

পরবর্তীতে তার মাযহাব মূর্তিপূজা ও ব্যক্তিপূজা তথা ব্যক্তির ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী মতবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আব্দুল হুসাইন আল-আসকারি তার সম্পর্কে বলেন: "ইব্‌ন নুসাইর ইমাম

---

[1] আবু শুআইব মুহাম্মদ ইব্‌ন নুসাইর আন-নুমাইরি শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়ার তিন ইমামের সংঘ লাভ করেছেন, যথা: আবুল হাসান আলি ইব্‌ন মুহাম্মদ "আল-হাদি", (২১২-২৫৪হি.), আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইব্‌ন আলি "আল-আসকারি", (২৩২-২৬০হি.) এবং আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইব্‌ন আল-হাসান "আল-মাহদি"। নুসাইরি দাবি করেন, তিনি হাসান আস-কারির বাব, তার ইলমের উত্তরাধিকারী, হুজ্জত ও তার পরবর্তীতে শিয়াদের কেন্দ্রস্থল। দ্বাদশ ইমাম অদৃশ্য হলে তিনি তারও বাব এবং শিয়াদের কেন্দ্রস্থল দাবি করেন। পরবর্তীতে সে অবশ্য হাসান আল-আসকারির বাব হওয়াকে অস্বীকার করে নবুওয়ত, রিসালাত ও আলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর উলুহিয়্যাত দাবিসহ নানা দাবি করেছে। অনুবাদক।

[2] ইমামিয়াদের দাবি মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আল-আসকারির "বাব" রয়েছে, তবে তিনি নুসাইরি নন। অনুবাদক।

আবুল হাসান আল-আসকারির মধ্যে রুবুবিয়্যাত দাবি করে নিজেকে তার পক্ষ থেকে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রচার করে”।[1]

ইব্‌ন নুসাইর এর মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন ব্যক্তি নুসাইরি ফেরকার নেতৃত্ব দেন, যারা স্ব স্ব মতামত দ্বারা তাদের মাযহাবকে প্রভাবিত করেন, ফলে তাদের আকিদায় বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় ও নানা মতবাদের জন্ম নেয়। তাদের মধ্যে আবু মুহাম্মদ আল-জানবালানি ও তার শিষ্য হুসাইন ইব্‌ন হামদান আল-খুসাইবি, এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আলি আল-জালি, আলি আল-জিসরি, মায়মুন ইব্‌ন সারজুন ইব্‌ন কাসেম আত-তাবরানি, হাসান আল-মাকযূন আস-সানজারি অন্যতম। সানজারি নুসাইরিদের সর্বশেষ শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিল। তার মৃত্যুর পর নুসাইরিদের অবস্থা সম্পর্কে ড. সুলাইমান আল-হালবি বলেন:

“হাসান আল-মাকযূন আস-সানজারির মৃত্যুর পর নুসাইরিরা কয়েকটি দীনি প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত হয়ে যায়, যার একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক ছিল না। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় কেন্দ্রের রূপ পরিগ্রহ করে ও তার প্রধানকে শায়খ উপাধি দেয়া হয়। এভাবে প্রত্যেক শায়খ একটি করে কেন্দ্রের নেতৃত্ব দেন, হোক ছোট। এভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে তারা মুসলিমদের

---

[1] “আল-আলাবি”: (পৃ.১৫), আরো দেখুন: “ফেরাকুশ শিয়াহ”, লিন নওবখতি: (পৃ.৭৮)

গাফলতির সুযোগে নিকট অতীতে সিরিয়ায় ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এভাবে তাদের শক্তি ও নেতৃত্ব পুনরায় সংগঠিত হয়, তারা মুসলিমদের ঘাড়ে চেপে বসে”।[1]

কিন্তু এবারের উত্থানে তারা নতুন কৌশল ও ধোঁকা দেয়ার লোভনীয় নাম গ্রহণ করে, যেমন “সমাজতান্ত্রিক বাথ পার্টি” এবং জনগণকে প্রগতি ও স্বাধীনতার বাণী শুনায়। সন্দেহ নেই, নাম পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য তাদের আসল রূপ থেকে মানুষের দৃষ্টি হটানো ও অবহেলিতদের কাছে টানা।

[1] “তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ”: (পৃ.৪২)

পঞ্চম অধ্যায়

নুসাইরিদের কর্তৃক তাদের আকিদার গোপনীয়তা রক্ষা করা:

নুসাইরিরা তাদের দীন ও মাযহাবকে গূঢ় রহস্য জ্ঞান করে, যা নিজেদের ব্যতীত বাইরে প্রকাশ করা বৈধ নয়। তাদের মাযহাবের কোনো বিষয় যে প্রকাশ করবে, তাকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা করাই তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কারণ সে "আলি আ'লা"র রহস্য ফাঁস করে দিয়েছে। এর একটি উদাহরণ: সুলাইমান আদানি, যিনি "আদেনা প্রদেশের"[1] জনৈক নুসাইরি শায়খের সন্তান ছিলেন। তিনি আমেরিকান খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন, অতঃপর লাজেকিয়ায়[2] বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি "আল-বাকুরাতুস সুলাইমানিয়াহ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে তিনি নুসাইরিয়া আকিদার অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

---

[1] আদেনা (أضنة) শহরটি বর্তমান তুরস্কের পঞ্চম বৃহত্তম শহর। আদেনা প্রদেশের রাজধানী আদেনা শহরেই, যা এক সময় সিরিয়ার অঙ্গরাজ্য ছিল, বর্তমান তুর্কীদের অধীনে। ভূমধ্য সাগর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরত্বে তুরস্কের দক্ষিণে অবস্থিত। অনুবাদক।

[2] ইংরেজি নাম "লাটাকিয়া", এ অঞ্চল সম্পর্কে জানার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে "লাটাকিয়া"-এর টিকা দেখুন। অনুবাদক।

আমেরিকান খ্রিস্টানরা ১৮৬৩ই. সনে বৈরুত থেকে বইটি প্রকাশ করে।

লাজেকিয়ায় কয়েক বছর থাকার পর তার আত্মীয়রা তাকে পত্র লিখে ও নিজ এলাকায় ফিরে আসার জন্য প্রলুব্ধ করে। এ জন্য তারা মহব্বত ও মোসাহেবির সকল পন্থা বেছে নেয়, ফলে সে তাদেরকে বিশ্বাস করে নিজ দেশে চলে আসে। অতঃপর তারা তাকে জীবিত জ্বালিয়ে হত্যা করে এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে তার লিখিত কিতাবের সকল কপি জব্দ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, ফলে ধীরে ধীরে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। বর্তমান তার একটি কপিও পাওয়া যায় না।[1]

এভাবে তাদের আকিদার কোন বিষয় যে প্রকাশ করে, বা তার প্রতি ইঙ্গিত করে, যা শির্ক ও মূর্তিপূজার বিশ্বাসে পূর্ণ, তারা তাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। ধর্ম ত্যাগকারীর উপর শারীরিক নির্যাতন করার পথই তারা বেছে নেয়। কারণ তারা বিশ্বাস করে ধর্ম গোপন রহস্য, পর্যালোচনা বা দলিল দ্বারা কাউকে বুঝানোর অবকাশ রাখে না। এ জন্য তারা ধর্ম নিয়ে কোনো গবেষণা বা পর্যালোনার জন্য প্রস্তুত নয়।

---

[1] "দায়েরাতু মা'আরিফিল কারনিল ইশরিন": (১০/২৪৯, ২৫০), "আল-আলাবিউন": (পৃ.৬৩) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

মুহাম্মদ ফরিদ ওয়াজদি "বাকুরাতুস সুলাইমানিয়্যাহ" গ্রন্থের সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরূপ:

১- নুসাইরি আলাবি সম্প্রদায় ইমাম আলির উলুহিয়্যাত বিশ্বাস করে। তাদের একদল বলে: আলি চাঁদে অন্তরীণ হয়েছেন। তাদেরকে "শিমালিয়াহ" বলা হয়। অপরদল বলে: আলি সূর্যে অন্তরীণ হয়েছেন। তাদেরকে "কালাযিয়াহ" বলা হয়। তাই তারা সূর্য, চাঁদ ও সকল তারকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

২- তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাদের নিকট নেককার রূহসমূহ তারকায় অন্তরীণ হয়। এ জন্য তারা আলিকে "আমিরুন নাহাল" অর্থাৎ তারকাদের আমির বলে। খারাপ রূহসমূহ জীব-জন্তুর মধ্যে অন্তরীণ হয়, তারা যেগুলোকে নাপাক বলে, যেমন শূকর, বানর ও শিয়াল।

৩- তাদের গোপন কালিমা মাত্র তিনটি হরফ, যথা (ع.م.س) অর্থাৎ আলি, মুহাম্মদ ও সালমান।

৪- কুরআন ছাড়া তাদের আরেকটি পবিত্র গ্রন্থ রয়েছে, যার উপর তারা পূর্ণবিশ্বাসী এবং যার থেকে তারা সমাধান গ্রহণ করে। কুরআন তাদের নিকট দ্বিতীয় গ্রন্থের মর্যাদা রাখে।

৫- তাদের আকিদা মূর্তিপূজা ও ইসলামি চরমপন্থার ন্যায় সামঞ্জস্যহীন।[1]

নুসাইরি “আলি ঈদ” লেবাননের ত্রিপলিতে অবস্থিত “নুসাইরিয়া সংস্থা”র প্রধান নির্বাচিত হলে “আল-হাওয়াদেসুল লুবনানিয়াহ” পত্রিকার মালিক তার সংবাদ প্রচার করেন। এ অপরাধে তারা তাকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে। এ জাতীয় অনেক ঘটনা রয়েছে, যা থেকে প্রতিয়মান যে, তারা নিজেরা তাদের ধর্মের সত্যতা ও শুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দিহান। তারা জানে তাদের ধর্ম ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, ধোঁকাবাজি ও বাতুলতায় পূর্ণ, এ জন্য গোপন রাখাই তাদের জন্য নিরাপদ। তারা অন্তরে মুসলিমদের প্রতি হিংসা ও ষড়যন্ত্র লালন করে।

তাদের নিয়ত শুদ্ধ হলে, কিংবা তাদের ধর্ম সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে, তারা কখনো তাদের ধর্ম প্রচারের ফলে ভীত হত না, বরং খুশি হত। যেমন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত খুশি হয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত চায় দুনিয়ার সবাই তাদের দীন পড়ুক ও তার জ্ঞান অর্জন করুক। তারা আল্লাহর নির্দেশ ও কুরআনে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার কারণেই পথভ্রষ্ট আলেম ও দুষ্ট নেতাদের সাথে তর্ক এড়িয়ে চলে।

---

[1] “দায়েরাতু মায়ারিফিল কারনিল ইশরিন”: (১০/২৪৯, ২৫০), “আল-আলাবিউন”: (পৃ.৬৩) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

নুসাইরিদের নিশ্চিত বিশ্বাস, যদি তাদের অনুসারীগণ সহি আকিদা জানে, তাহলে তাদের সামনে মাথানত করা ও তাদের আনুগত্য করা ছেড়ে দিবে। এ জন্য অনুসারীদের থেকে তাদের প্রথম দাবি ধর্মের গোপনীয়তা রক্ষা।

তাদের পবিত্র গ্রন্থ "আল-হাফতুশ শরিফ"এ ধর্মের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বর্ণিত হয়েছে, মুফাদ্দাল আল-জু'ফি এমন এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যিনি বারবার পুনর্জন্মের কারণে আর পুনর্জন্মের পালা শেষ করেছেন, তিনি তাকে বলেছেন: "হে আমার ভাই, আমি তোমাকে ও আমাকে আল্লাহর গোপনীয়তা রক্ষার ওসিয়ত করছি। আমার গোপনীয়তা পর্দাবৃত, তবে তোমার তাওহিদি ভাইদের থেকে নয়, যারা "আলি আ'লা"র মারেফাত হাসিল করে নৈকট্য অর্জন করেছে। অতঃপর তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। সাদেক বলেন: এ সপ্তাহে তিনি আমার কাছে তিনবার এসেছেন ও আমাকে সালাম করেছেন, আমি তোমাদের মধ্যেই ছিলাম, কিন্তু তোমরা তাকে চিন নি"।[1]

"আল-হাফতুশ শরিফের" লেখক বর্ণনা করেন, সাদেক মুফাদ্দালকে বলেন: "হে মুফাদ্দাল, তোমাকে অনেক ফযিলত দেয়া হয়েছে, তুমি অনেক ইলম অর্জন করেছ, অতএব তুমি আল্লাহর গোপনীয়তা রক্ষা কর, তার জ্ঞান কাউকে দেবে না, একমাত্র

---

[1] "আল-হাফতুশ শরিফ": (পৃ.৫৪)

খালেস বন্ধু ব্যতীত। যদি তুমি আমাদের শত্রুর কাছে তা প্রকাশ কর, তাহলে তুমি নিজে নিজেকে হত্যা করতে সাহায্য করলে”।[1]

“আল-হাফতুশ শরিফের” লেখক সকল মুসলিম সম্পর্কে বলেন, তারা নাপাক ও সাধারণ লোক, তবে যারা নুসাইরিয়া ধর্ম গ্রহণ করে তারা নয়। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন: “হে মুফাদ্দাল, নিশ্চয় এ ইলম আল্লাহর গোপন রহস্য ও তার খাজানা, তার নির্দিষ্ট অলিগণ ব্যতীত যার জ্ঞান কেউ অর্জন করতে পারে না। আল্লাহ চান নাপাক লোকেরা যেন এ জ্ঞানের প্রতি তাকিয়ে না দেখে। অতঃপর তিনি পড়েন:

﴿ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ٢٦ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٖ فَإِنَّهُۥ يَسۡلُكُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ رَصَدًا ٢٧ ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]

“তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তার অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তার মনোনীত রাসূল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন”।[2]

---

[1] “আল-হাফতুশ শরিফ”: (পৃ.১০২)

[2] সূরা আল-জিন: (২৬-২৭)

ষষ্ঠ অধ্যায়

নুসাইরি ধর্ম শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি

ক. নারীদের ধর্ম শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি:

নুসাইরি নারীদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে মূর্খ নারী জ্ঞান করা হয়, তবে তাদের শিক্ষা থেকে মুক্তিপ্রাপ্তা নারীগণ ব্যতীত। তাদের মাযহাবের দাবি কোন নারীকে মাযহাবের রহস্য জানানো যাবে না। কারণ তাদের দৃষ্টিতে নারীর বিবেক ও দৃঢ়তা দুর্বল। দ্বিতীয়ত পুরুষের তুলনায় নারী অধিক দুষ্ট, ছলনাময়ী ও ষড়যন্ত্রকারী। তারা সকল অনিষ্টের মূল, "আল-হাফতুশ শরিফ"এ অনুরূপই বলা হয়েছে। তাদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাই জ্ঞান, অর্থাৎ নুসাইরি নারী তুলনামূলক অধিক অজ্ঞ।

অতএব নুসাইরি নারীর কোন ধর্ম নেই,[1] তাদের উক্ত কিতাবে নারীদের থেকে সতর্ক থাকার অনেক উপদেশ রয়েছে। তাতে নারীদের থেকে প্রকাশ পাওয়া অনেক অপকর্মের বর্ণনা রয়েছে। দুষ্ট পুরুষদেরকে পুনর্জন্মে নারী বানিয়ে শাস্তি দেয়া হয়, যদি সে পূর্বের জীবনে মুমিন না হয়, অর্থাৎ নুসাইরি না হয়, বা নুসাইরি

---

[1] দেখুন: "দায়েরাতু মা'আরিফিল কারনিল ইশরিন", মূল ধাতু: (نصر), "আল-আলাবিউন": (পৃ.৫৭), "তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ": (পৃ.৪৩)

ভাইদের উপর যুলম করে, বা শায়খদের সম্মান না করে ও তাদেরকে উপহার ও উন্নত খাবার না দেয়।[1]

মুফাদ্দাল আল-জু‘ফি সাদেক থেকে বর্ণনা করেন, (যা মূলত সাদিকের উপর তাদের মিথ্যাচার), তিনি মাযহাবের গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন: “অনুরূপ কাফেররা পুরুষের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে সাধারণ কাফের নারীতে পরিণত হয়”। মুফাদ্দাল বলল: হে আমার মনিব, আপনার পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নারীরা পুরুষদের চেয়ে বেশী খারাপ, তারা অধিক ছলনাময়ী ও ষড়যন্ত্রকারী। সাদেক বললেন: হে মুফাদ্দাল, প্রত্যেক খারাপির মূল নারী। আমাদের পিতা আদমকে যখন জান্নাত থেকে বের করা হয়েছিল,[2] তার কারণ ছিল হাওয়া। সে তাকে নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করে।

অনুরূপ কাবিল সহোদর ভাই হাবিলকে হত্যা করেছে নারীর কারণে। তুমি নূহ ও লুতের স্ত্রীর ঘটনা আল্লাহর কালামে দেখ নি,

---

[1] “আল-জিয়ালুত তালী”: (পৃ.৯)

[2] তাদের বিশ্বাস আমাদের আদমের পূর্বে সাতজন আদম ছিল, প্রত্যেক আদম একটি জাতির ন্যায়। সব আদম শেষে আমাদের আদম আগমন করেছেন, তিনি অষ্টম নাম্বার। দেখুন: আল-হাফতুশ শরিফ”: (বাব: ৬০ও৬১, পৃ.১৫০ ও ১৫৩)

তারা কিভাবে স্ব স্ব স্বামীর খিয়ানত করেছে[1]। অনুরূপ ইয়াহইয়াকে হত্যা করা হয়েছে জনৈক ব্যভিচারী নারীর কারণে। জাহান্নাম দেখে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর, কঠিন ও ধমকের সুরে বলেন: তিনি সেখানে তার অধিকাংশ অধিবাসী দেখেছেন নারী। অতঃপর সাদেক বলেন:

কেন এরূপ হবে না, তারা [নারীরা][2] ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে শক্তিশালী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তার থেকে [আলি][3] আলাইহিস সালাম বলেন: শয়তানরা তো নারীই, মানুষ যখন কুফরি, সীমালঙ্ঘন ও একগুয়েমির চরম পর্যায় পৌঁছে যায়, তখন সে ইবলিসে পরিণত হয় ও তাকে নারীর আকৃতিতে প্রেরণ করা হয়। আমি বললাম: সুবহান্নাল্লাহ হে আমার মনিব! আমি কখনো

---

[1] খিয়ানতের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা এই যে, তারা নবীদের দীন প্রত্যাখ্যান করে তাদের খিয়ানত করেছে, পবিত্রতা ও সম্মানের ক্ষেত্রে খিয়ানত করে নি। ইব্ন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: "কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচার করেনি"। দেখুন: "আয়সারুত তাফাসির: (৫/৩৮৯, ৩৯১)

[2] ব্রাকেটের নারী শব্দটি অনুবাদক কর্তৃক বর্ধিত, মূল কিতাবে এখানে পুরুষের সর্বনাম "হুম" রয়েছে, যার অনুবাদ করা হয়েছে "তারা" সর্বনাম দ্বারা। এখানে যেহেতু নারীর আলোচনা চলছে, তাই "হুম" এর স্থলে "হুন্না" স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম সঠিক ছিল। কারো ভুলে হয়ত এরূপ হয়েছে। অনুবাদক।

[3] ব্রাকেটের আলি শব্দটি অনুবাদক কর্তৃক বর্ধিত।

এরূপ শুনিনি, আমি ভাবিনি এ বিষয়টি আমাকে কাঁদাবে। সাদেক বলল: তুমি কুরআনে আল্লাহর বাণী পড়নি:

﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ٧٦﴾ [النساء : ٧٦]

"নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল"।[1] তিনি অন্যত্র বলেছেন:

﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٨ ﴾ [يوسف: ٢٨]

"নিশ্চয় তোমাদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক"।[2] এগুলো নারীদের আকৃতি। আমি বললাম: আমার মনিব সত্য বলেছেন"।[3]

নারীদের প্রতি তাদের অশুভ দৃষ্টির কারণে তারা নারীদের সংশোধন কল্পে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি। তারা প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে তাদের দূরে রাখে, বিশেষ করে দীনের গোপনীয়তা থেকে। পক্ষান্তরে ইসলাম তার বিপরীত। ইসলাম তাকে দায়িত্বশীল ও জিম্মাদার বানিয়েছে। আল্লাহ কারো আমলই বিনষ্ট করেন না, হোক সে পুরুষ বা নারী। আল্লাহ পুরুষকে যা নির্দেশ দিয়েছেন, নারীকেও তা নির্দেশ দিয়েছেন, তবে নারীদের স্বার্থে কিছু বিষয় ব্যতিক্রম রয়েছে। ইসলাম নারীকে সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার দিয়েছে। সম্পদের যাকাত দেয়া, সদকা করা ও নেক আমলের প্রতি নারীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, বরং

---

[1] সূরা আন-নিসা: (৭৬)

[2] সূরা ইউসূফ: (২৮)

[3] "আল-হাফতুশ শরিফ": (পৃ.১৪৪)

মায়েদের পায়ের নিচে জান্নাত ঘোষণা দিয়েছে।[1] আল্লাহ নারীর [মাতার] আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার আনুগত্যের সাথে নিজের আনুগত্য একত্রে উল্লেখ করেছেন।

ইসলাম নারীদের যে সম্মান ও অধিকার দিয়েছে, তার সামনে নারীবাদীদের মাথা লজ্জায় অবনত করা উচিত, কিন্তু তার অধিকাংশ তারা জানে না, ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলে: ইসলাম নারীদের উপর জুলম করেছে। ইসলাম সম্পর্কে না জেনে এ বিষয়ে কথা বলা তাদের বোকামি বৈ কিছু নয়। তাদের উচিত প্রথমে ইসলামে নারীর অধিকারগুলো জানা, জ্ঞানীদের লেখা পড়া, তাহলে নিশ্চিত ইসলামের সামনে তারা নিজেদের হেয় জ্ঞান করত।

খ. পুরুষদের ধর্মের রহস্য শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি:

নুসাইরিরা কিভাবে নারীকে দীন শিক্ষা দেয় উপরে আমরা তার বর্ণনা দিয়েছি। এখানে আমরা পুরুষকে দীনদার বানানো বা তাকে দীন শিখানোর পদ্ধতি আলোচনা করব। দেখুন কঠোর গোপনীয়তা রক্ষার পর কিভাবে তারা পুরুষকে দীন শিক্ষা দেয়। নুসাইরি

---

[1] এ সম্পর্কিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন: ইমাম আহমদ, নাসায়ি, ইব্‌ন মাজাহ ও হাকেম, তিনি হাদিসটি সহিহ বলেছেন। তবে ইমাম সাখাবি এ হাদিসের সনদে ইজতিরাব উল্লেখ করেছেন। দেখুন: “আল-মাকাসিদুল হাসানাহ”: (পৃ.১৭৬)

আকিদা যেহেতু সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ভ্রান্তিতে ভরপুর, তাই তারা সবার সামনে তাদের মাযহাব প্রকাশ করে না। তারা নিজেরাও একে অপর থেকে অনেক বিষয় গোপন করে, যতক্ষণ না পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা পরস্পর উত্তীর্ণ হয়। তাদের পরীক্ষায় রয়েছে নানা অপমান, বিভিন্ন প্রকার হীনতা ও অনুতাপ।

তাদের তৈরি অশ্লীল ও অমানবিক পদ্ধতিতে যখন একজন ব্যক্তি তাদের দীনে প্রবেশ করে, তখন তার পৌরুষত্ব ও চিন্তার স্বাধীনতা বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তাকে অসম্মান করা হয় ও তার ইজ্জত বিনষ্ট করা হয়।

নুসাইরি দীন শিখতে এসে ছাত্র প্রথমে শায়খদের মজলিসে উপস্থিত হয়, অতঃপর তাদের থেকে একজনকে বেছে নেয়, যার কাছ থেকে সে দীন শিখবে। তারা তাকে রূহানী পিতা বা দীনি পিতা নাম দেয়। অতঃপর ছাত্রকে তারা উস্তাদের আনুগত্য ও বিনা বাক্যে তার সামনে বিনয়ী হওয়ার দীক্ষা দেন। যেমন সূফীরা তাদের মুরিদদের আনুগত্য শিক্ষা দেয়ার জন্য বলেন: "পীরের সামনে নিজেকে এমনভাবে সপে দাও, যেমন মৃত ব্যক্তি গোসল দাতার সামনে নিজেকে সপে দেয়"।

শিক্ষার্থীকে অপমান করার আরেক পদ্ধতি: শিক্ষার্থী শ্রেণি কক্ষে প্রবেশ করে শায়খদের জুতো মাথায় নিয়ে একপাশে চুপ দাঁড়িয়ে থাকবে, কোন কথা বলবে না। অতঃপর তার খাস উস্তাদ অন্য

উস্তাদগণের নিকট তাকে গ্রহণ করার দরখাস্ত পেশ করে ও তাদের দলে নেয়ার আবেদন জানায়। শায়েখদের তাকে গ্রহণ করা সম্পন্ন হলে সে মাথা থেকে তাদের জুতো নামায় ও উপস্থিত শায়খদের হাত-পা চুম্বন করে।

অতঃপর সে স্বস্থানে দাঁড়ালে তার মাথার উপর একটি সাদা কাপড় রাখা হয়। উস্তাদ ও শিষ্যের মধ্যে একজন শায়খ অঙ্গিকারনামা পাঠ করেন, যা বিবাহের খুতবার ন্যায়। এ স্তরকে তারা বিবাহের প্রস্তাব, শ্রবণ করার স্তরকে বিবাহ, ইলম অর্জন করার স্তরকে গর্ভধারণ ও শিক্ষা দেয়ার স্তরকে তারা প্রসব করা বলে।

শিক্ষার এসব স্তর শেষে ছাত্রকে বলা হয়: তোমার প্রতিদিন পাঁচশত বার বি-হক্কে (ع.م.س) বলা ওয়াজিব, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। এসব নিষ্ঠুর পরীক্ষা মেনে নিয়ে সে আসে অবশিষ্ট শিক্ষার জন্য, যেখানে তাকে আরো কঠিন বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়, যদিও তাতে তার পুরুষত্ব চলে যায়।

নিম্নে আমরা নুসাইরি মাযহাব শিক্ষার কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করছি:

১- শিক্ষার্থীর বয়স উনিশের অধিক হওয়া জরুরি।[1]

---

[1] "আল-আলাবিউন আও আন-নুসাইরিয়্যাহ": (পৃ.৫৭), دائرة معارف القرن العشرين "مادة "نصر গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

২- নিম্নের স্তরগুলো ধীরে ধীরে সমাপ্ত করা জরুরি:

প্রথম-স্তর: এ স্তরকে মূর্খতার স্তর বলা হয়। এ স্তরে তারা নুসাইরি বংশ থেকে মনোনীত শিক্ষার্থীকে মাযহাবের গোপনীয়তা বহন করার উপযুক্ত করে তুলে।

দ্বিতীয়-স্তর: এ স্তরকে সম্পৃক্ত করার স্তর বলা হয়। এ স্তরে শিক্ষার্থীকে তারা মাযহাবের কতক বিষয় শিক্ষা দেয়। এ তবকায় শিক্ষার্থী কোনো শায়খের তত্ত্বাবধানে এক বছর বা দু'বছর অবস্থান করে, সে তাকে ধীরে ধীরে মাযহাবের গোপনীয়তা শিক্ষা দেয়। সে যদি তার মধ্যে গ্রহণ করা ও শিক্ষা হাসিলের যোগ্যতা দেখে, তৃতীয়-ধাপে উন্নীত করে, অন্যথায় বের করে দেয়।

তৃতীয়-স্তর: এ স্তরকে শ্রবণ করার স্তর বলা হয়। এ স্তরকে তারা উচ্চ স্তর বলে। এখানে শিক্ষার্থীকে নুসাইরি মাযহাবের অধিকাংশ বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়। অতঃপর তাকে মাযহাবের অন্যান্য গোপন বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্য নুসাইরি সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানকারী শায়েখগণ একটি বিশেষ মজলিস ডাকেন। অতঃপর শায়েখগণ তাকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যান, যাকে তদের ভাষায় শায়খের স্তর বা সাহেবুল আহ্দ বলা হয়।

অনেক কাফিল ও সাক্ষীর উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর এ স্তর সমাপ্ত করা হয়, তারা সবাই তার মধ্যে মাযহাবের গোপনীয়তা গ্রহণ করা ও তার হিফাজত করার যোগ্যতার সাক্ষী দেয়। অতঃপর

তার থেকে প্রচলিত শপথ নেয়া হয় যে, জান গেলেও মাযহাবের গোপনীয়তা রক্ষা করব। এ স্তর পার করে সে নুসাইরিদের শায়খে পরিণত হয়।[1]

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার্থী উস্তাদকে যত সময় দিক, যতক্ষণ না তার বিবেক ও চিন্তা শক্তি বিলোপ হয়, তাকে মাযহাবের কোনো বিষয় শিক্ষা দেয়া হয় না। যেন তার বিবেক তাদের নোংরা আকিদা গ্রহণে অস্বীকার না করে, যা দেখে অন্তর কেঁপে উঠে, বিবেক ধিক্কার জানায় ও সুস্থ মস্তিষ্ক ঘেন্না করে। যেমন, তারা মদ বণ্টনকারীর হাতে মদ ও তার অবস্থাকে আব্দুন নূর বলে। শিক্ষার্থীর উপর বিভিন্ন পর্যায়ে কঠোর অধ্যবসায় চেপে দেয়। অতঃপর তাকে মাযহাব শিক্ষার যোগ্য ও প্রতিকূল পরিবেশে মাযহাবের সংরক্ষণকারী হিসেবে গড়ে তুলে।

নুসাইরি শায়েখরা মাযহাবের গোপন বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্য যে আচরণ করে, তার বার্ণনা দিয়েছে তাদের মাযহাব গ্রহণকারী মাখলুফ নামে জনৈক ব্যক্তি। মুহাম্মদ হুসাইন তার বিবরণ দেন:

“নির্দিষ্ট দিনে অনেক শায়েখ, গ্রামবাসী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেক লোক জমা হল। তারা আমাকে তাদের নিকট ডেকে নিল ও

---

[1] “তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ”: (পৃ.৪৫ ও ৪৬), “আল-আলাবিউন”: (পৃ.৫৭), “দায়েরাতু মা‘আরিফিল কারনিল ইশরিন”, (نصر) ধাতু থেকে সংগৃহীত।

আমার হাতে মদের পাত্র তুলে দিল।[1] অতঃপর আমার পাশে একজন শায়খ দাঁড়ালেন, নুসাইরি ধর্মে তার উপাধি নকিব। তিনি আমাকে বললেন: “বল, হে আমার চাচা, আমার মনিব ও আমার মাথার মুকুট, আপনার অনুগ্রহের রহস্যের শপথ। আমি আপনার শিষ্য, আপনার জুতো আমার মাথার উপর”। আমার জীবনে এই প্রথম মদ পান করার ঘটনা কোনোভাবে এড়াতে পারলাম না। আমি যখন মদ পান করলাম, ইমাম আমার দিকে মুখ করে বললেন: তোমার উস্তাদের সম্মানার্থে উপস্থিত সবার জুতো তোমার মাথায় তুলতে রাজি আছ? আমি বললাম: কখনো না, বরং শুধু আমার উস্তাদের জুতো। নিয়মের প্রতি আমার অস্বীকৃতি প্রকাশের কারণে উপস্থিত সবাই হেসে দিল। অতঃপর তারা খাদেমকে বলল, সে আমার উস্তাদের জুতো আমার মাথা উন্মুক্ত করে তার উপর রাখল ও জুতোর উপর এক টুকরো সাদা কাপড় দিল। অতঃপর নকিব আমার মাথার উপর প্রার্থনা আরম্ভ করেন ও আমাকে গোপন রাখার নির্দেশ দেন। এরপর সবাই প্রস্থান করেন।

[1] নুসাইরিয়াহ দীন শিক্ষার অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, দীন শিক্ষার সময় শিক্ষার্থীকে অবশ্যই মদ্যপ অবস্থায় থাকতে হবে। আশ্চর্য! এ কেমন দীন, যার শুরু মদ ও লাঞ্ছনা!

চল্লিশদিন পর অপর এক জমাত জড়ো হল, তারা আমাকে তাদের নিকট ডেকে নিল। প্রধান শায়েখ মদের পাত্র নিয়ে আমার পাশে দাঁড়ালেন ও আমাকে পান করালেন। আমাকে বললেন, আমি যেন বলি: (ع.م.س) রহস্যের শপথ। অতঃপর ইমাম বললেন: এ কালিমাগুলো অর্থাৎ (ع.م.س) রহস্যের শপথ তোমার প্রতিদিন পাঁচশত বার পড়া ওয়াজিব। অতঃপর তারা আমাকে ধর্মের গোপনীয়তা রক্ষার উপদেশ দিলেন ও প্রস্থান করলেন।

আবার সাতমাস পর আমাকে নিয়ে অপর এক জমাত[1] জড়ো হল, সাধারণের জন্য যার মেয়াদ নয় মাস। তাদের অভ্যাস মোতাবেক আমাকে তারা ডাকল ও তাদের থেকে দূরে দাঁড় করাল। তারা সবাই ইমামের সামনে ধর্মীয় রেওয়াজ অনুযায়ী দাঁড়াল। অতঃপর সমবেত সবার থেকে একজন উকিল দাঁড়ালেন, তিনি ইমামকে বললেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ হে সায়্যেদ ইমাম। ইমাম তাকে বলল: তোমার উদ্দেশ্য কি, তুমি কি চাও? সে উত্তর দিল: রাস্তায় আমার সাথে একব্যক্তির দেখা... [একপর্যায়ে বলল:] তার নাম মাখলুফ। সে আপনাদের কাছে আদব শিখতে এসেছে।

---

[1] এ ধর্মের প্রত্যেকের উপর দীনের সবক'টি ধাপ অতিক্রম করা জরুরি। আমার ধারণা এতো কঠোর গোপনীয়তার ফলে তাদের দীনের দাওয়াত ব্যাপক ছিল না।

তিনি বললেন: কে তাকে আমাদের সন্ধান দিয়েছে? সে উত্তর দিল:

(المعنى المعنى، والاسم العظيم، والباب الكريم وهي لفظة ع.م.س)

ইমাম বললেন: তাকে নিয়ে আস, আমরা তাকে দেখব। আমার উস্তাদ আমার হাত ধরে ইমামের নিকট নিয়ে গেলেন। আমি যখন তার নিকটবর্তী হলাম, তিনি আমার জন্য তার দু'পা প্রসারিত করলেন আমি তার দু'পা ও দু'হাত চুম্বন করলাম। তিনি আমাকে বললেন: হে যুবক তোমার কি প্রয়োজন, তুমি কি চাও? অতঃপর নকিব উঠে আমার পাশে দাঁড়ালেন ও আমাকে বলতে শিখালেন:

(بسر الذي أنتم فيه يا معاشر المؤمنين)

অতঃপর ভ্রুকুটি করে আমার দিকে তাকালেন ও বললেন: মুতি ও পরশ পাথরে আবৃত রহস্য জানার জন্য তুমি কেন আমাদের নিকট এসেছ, যা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা বা প্রেরিত নবী ব্যতীত কেউ গ্রহণ করে নি? হে বৎস, জেনে রেখ, ফেরেশতাদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যতীত কেউ এ রহস্য গ্রহণ করে নি। নবীদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু পরীক্ষিত ব্যতীত কেউ এ রহস্য গ্রহণে সক্ষম হয় নি। তুমি কি প্রস্তুত, তোমার মাথা কাটা যাবে, হাত কাটা যাবে, পা কাটা যাবে, তবু তুমি এ রহস্য প্রকাশ করবে না? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার পক্ষে এক শো জিম্মাদার চাই। তখন উপস্থিত সবাই বলল: হে আমাদের মনিব-

ইমাম, আল-কানুন, ফলে তিনি বলেন: তোমাদের সম্মানার্থে অন্তত বারো জন অবশ্যই জরুরি।

অতঃপর দ্বিতীয় উস্তাদ দাঁড়ালেন ও বারো জিম্মাদারের হাতে চুমু খেলেন, আমিও তাদের হাত চুমু খেলাম।

অতঃপর কাফিল, তথা জিম্মাদারগণ উঠে দাঁড়াল ও বলল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হে আমাদের মনিব ইমাম। ইমাম বললেন: হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ তোমাদের কি প্রয়োজন? তারা বলল: আমরা আপনার নিকট মাখলুফের দায়িত্ব নেয়ার জন্য এসেছি। তিনি বললেন: যদি সে এ গোপন রহস্য প্রকাশ করে, তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে, আমরা তাকে টুকরো টুকরো করব, তার রক্ত পান করব? তারা বলল: হ্যাঁ, তিনি বললেন: আমি শুধু তোমাদের জিম্মাদারিকে যথেষ্ট মনে করি না, বরং দু'জন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি চাই, যে তোমাদের দায়িত্ব নিবে।

উপস্থিত কাফিলদের থেকে একজন সামনে এগিয়ে গেলেন, আমি তার পাশেই ছিলাম, তিনি নির্দিষ্ট দু'জন কফিলের হাতে চুমু খেলেন। আমিও তাদের হাতে চুমু খেলাম। অতঃপর তারা উভয়ে বুকে হাত রেখে উঠে দাঁড়ালেন। ইমাম তাদের দিকে তাকালেন ও বললেন: হে নির্ভরযোগ্য পবিত্র জিম্মাদারগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, তোমরা কি চাও? তারা উভয়ে উত্তর দিল আমরা আপনার নিকট এসেছি বারোজন কাফিল ও

তার জিম্মাদারি গ্রহণ করার নিমিত্তে। তিনি বললেন: যদি সে এসব সালাত মুখস্থ করার পূর্বে পলায়ন করে বা এ রহস্য প্রকাশ করে, তাহলে তোমরা তাকে হত্যার জন্যে নিয়ে আসবে? তারা উভয়ে বলল: হ্যাঁ। ইমাম বললেন: জিম্মাদারগণ নিঃশেষ হয়ে যাবে, জিম্মাদারদের জিম্মাদারীও নিঃশেষ হবে, কিন্তু আমি তার থেকে এমন এক জিনিস চাই যা কখনো শেষ হবে না। তারা তাকে বলল: আপনার যা ইচ্ছা করুন, অতঃপর তিনি আমার দিকে মুখ করে বললেন:

হে মাখলুফ কাছে আস, আমি তার কাছে গেলাম। তিনি আমাকে সপ্ত আসমানের কসম দিলেন, যেন আমি এ রহস্য প্রকাশ না করি। অতঃপর আমার ডান হাতে "আল-মাজমু" গ্রন্থ দিলেন ও আমার পাশে দণ্ডায়মান নকিব আমাকে বলতে শিখালেন: হে আমার মনিব ইমাম, মহান এ রহস্যের উপর আমার কসম গ্রহণ করুন। আপনি আমার সকল অপরাধ থেকে মুক্ত। তিনি আমার থেকে "আল-মাজমু" কিতাবটি গ্রহণ করলেন, যা হাস্তাক্ষরে লিখা ছিল... তিনি বলেন: অতঃপর ইমাম বললেন: হে আমার বৎস, জেনে রেখ, যদি তুমি এ রহস্য প্রকাশ কর, তাহলে জমিন তোমাকে গ্রহণ করবে না। তুমি পুনরায় মানুষের পোশাকেও প্রবেশ করতে পারবে না, বরং তোমার মৃত্যুর পর থেকে তুমি বিকৃত জন্তুতে প্রবেশ করবে, তার থেকে কখনো মুক্তি পাবে না।

অতঃপর তারা আমাকে তাদের মাঝে বসাল, আমার মাথা উন্মুক্ত করল ও তার উপর একটি পর্দা রেখে দিল। অতঃপর কাফিলগণ আমার মাথার উপর হাত রেখে উপাসনা আরম্ভ করল। তারা প্রথমে সূরা ফাতহ, সূরা সূজুদ ও আইন পড়ল। অতঃপর মদ পান করল ও সূরাতুস সালাম পাঠ করে আমার মাথার উপর থেকে তাদের হাত হটাল।[1]

খাদেম আমাকে প্রথম উস্তাদের নিকট সোপর্দ করল। অতঃপর তিনি হাতে মদের পাত্র নিয়ে আমাকে পান করালেন ও বলতে শিখালেন: "বিসমিল্লাহ,[2] আল্লাহ ও সায়্যেদ আবু আব্দুল্লাহর রহস্যের শপথ, যিনি আল্লাহর মারেফাতের জ্ঞানে জ্ঞানী। তিযকার ও সালেহের রহস্যের শপথ, আল্লাহ তাকে সৌভাগ্যশীল করুন"।

অতঃপর সবাই চলে গেল, শায়খ সালেহ জাবালি আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে চললেন ও আমাকে শিক্ষা দেয়া আরম্ভ করলেন, প্রথমে শিক্ষা দিলেন "তাবাররি" অর্থাৎ গালি। এ সময় তিনি আমাকে নুসাইরি সালাত শিক্ষা দেন। যেখানে রয়েছে আলির ইবাদত, অর্থাৎ ষোলটি সূরা"।[3]

---

[1] দেখুন: "আল-জাইলুত তালি": (পৃ.৩৯-৪৭)

[2] মদ পান করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা শিখায়!!!

[3] এগুলো হচ্ছে কিছু দোয়া ও দুর্বোধ্য বাক্য, যার অধিকাংশ আমিরুন নাহলের মোনাজাত থেকে সংগৃহীত। আমিরুন নাহাল দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য আলী ইব্ন

আমি মখলুফের ঘটনার বর্ণনাক্রম ঠিক রেখে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছি, তাই বেশ কিছু বিষয় ত্যাগ করেছি।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, নুসাইরিদের মাযহাব শিক্ষা দেয়ার একটি জামাত বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা মানুষের বিবেক হরণকারী। তাদের উদ্দেশ্য যেভাবে হোক নেতৃত্ব ও সম্পদ জমা করা। তারা কতিপয় লোক পেয়েছে, যারা তাদের পথভ্রষ্টতা ও বাতিল পন্থাকে সত্য জ্ঞান করছে। যার সূচনা (ع.م.س) এর অযিফা এবং সমাপ্তি গায়রুল্লাহর ইবাদত। তারা পারস্যের মূর্তিপূজারীদের থেকে আমদানি করা শির্কের মাধ্যমে মানুষের সরলতা ও বিবেক নিয়ে তামাশা করছে। তারা এসব শয়তানী মতবাদ দ্বারা একটি জাতিকে বিভ্রান্ত করে সঠিক দীন থেকে বিচ্যুত করছে।

আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, আল্লাহ তাকে নুসাইরিদের দীন থেকে মুক্ত রেখেছেন, যা শির্ক ও আলির রুবুবিয়্যাত আকিদায় পরিপূর্ণ। যেমন তারা বলে তিনিই আল্লাহ, রাব্বুল আলামিন, আসমান ও জমিন সৃষ্টিকারী। আমরা এসব উল্লেখ করে কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না, প্রয়োজন হলে “আল-জাইলুত তালি” গ্রন্থটি দেখুন।

সপ্তম অধ্যায়

নুসাইরিদের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা:

নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের জাহেরি ও বাতেনি উভয় প্রকার আকিদা রয়েছে, তবে বাতেনি আকিদার সংখ্যাই বেশী। তাদের কতিপয় মৌলিক আকিদা এখানে উল্লেখ করা হল:

প্রথম আকিদা: আলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রভুত্বে বিশ্বাস করা। নুসাইরিরা সম্প্রদায় আলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রভুত্বে বিশ্বাস করে। তাদের মাযহাবে এটা আশ্চর্য কিংবা নতুন কোনো বিষয় নয়, কারণ তারা আসলে ছিল মূর্তিপূজক, গাভীর ইবাদতকারী ও লিঙের উপাসনাকারী। তারা যখন পার্থিব স্বার্থে ইসলামে প্রবেশ করে, বরং সত্যিকার অর্থে বাহ্যিকভাবে ইসলাম জাহির করে, তখনো তাদের আকিদা ছিল: ইমাম আলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইলাহ বিশ্বাস করা। তাদের ধারণা আলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বাহ্যত ইমাম ছিলেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণভাবে ছিলেন ইলাহ। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, তাকে কেউ জন্ম দেয় নি। তিনি মারা যান নি, তাকে মারা হয় নি, তিনি পানাহার করেন না।

তাদের আকিদা মতে আলির মধ্যে আল্লাহ প্রবেশ করেছেন, আর আলি মুহাম্মদকে নবী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা কুফরির শেষ প্রান্তে পৌঁছে বলেছে: আলি মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছে, মুহাম্মদ সৃষ্টি

করেছে সালমান ফারসিকে, সালমান ফারসি সৃষ্টি করেছে পঞ্চ ইয়াতীমকে, যাদের হাতে আসমান-জমিনের নিয়ন্ত্রণ। তারা হলেন:

১. মিকদাদ: তিনি মানুষের রব ও সৃষ্টিকর্তা। তার দায়িত্বে রয়েছে বিদ্যুৎ চমক, মেঘের গর্জন ও ভূমিকম্প।

২. আবুদ দার: (আবুযর গিফারী), তিনি নক্ষত্র ও তারকারাজির কক্ষপথসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন।

৩. আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা আল-আনসারী: তিনি বাতাসের নিয়ন্ত্রক ও মানুষের রূহ কব্জাকারী।

৪. উসমান ইব্ন মায'উন: তিনি শরীরের জ্বর, পেট ও মানুষিক রোগ নিয়ন্ত্রণকারী।

৫. কুন্বর ইব্ন কাদান: তিনি মানুষের শরীরে রূহ সঞ্চারকারী।[1]

এসব আকিদা লালন করে তারা নিজেদের অগ্নিপূজারী প্রমাণ দেয়, তারা ইসলামের নাম ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করে নি। এসব আকিদা কুফরির চূড়ান্ত পর্যায়ের আকিদা, এর যে কোনো একটিই আল্লাহর দীন থেকে বের করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

তারা এ আকিদার যুক্তি হিসেবে বলে: আল্লাহ তা'আলা পবিত্র মা'বুদ, যখন ইচ্ছা তিনি শরীরে প্রবেশ করেন। সকল কর্তৃত্ব তার, তার নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তনকারী।

---

[1] "তায়েফাতুন নুসাইরিয়্যাহ": (পৃ.৪৭), আরো দেখুন: (الجيل التالي) (পৃ.১১৩)

আলি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের এসব কুফরি থেকে মুক্ত। তারা বিশ্বাস করে তিনি বাহ্যিকভাবে ইমাম, অভ্যন্তরীণভাবে ইলাহ। তারা তার সত্তাকে দু’ভাগে ভাগ করেছে:

এক. বাহ্যিকরূপ, অর্থাৎ তার মানবিক রূপ, যাকে নাসুত বলা হয়। তার এ সত্তা খায়, পান করে, জন্ম দেয়, জন্ম নেয় ও বান্দাদের নিকটবর্তী হয়, যেন তারা কাছ থেকে তাকে চিনতে পারে।

দুই. বাতেনিরূপ, অর্থাৎ “লাহুত”: যা পানাহার করে না।

নুসাইরিদের বোকামি:

তারা আলির খায়বার জয় করা ও যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনকে উলুহিয়্যাতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করে। তাদের বিশ্বাস তিনি জিনদের সাথে কথা বলতেন। মুহাম্মদের দায়িত্ব বাহ্যিক কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা, আর আলির দায়িত্ব আভ্যন্তরীণ মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ করা। কারণ তিনি তাদের বাতেনি অবস্থা জানতেন।

আলি মৃত্যুবরণ করে অর্থাৎ তাদের ভাষায় মানবীয় পোশাক ত্যাগ করে কোথায় প্রবেশ করেছেন, এ নিয়ে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে:

কেউ বলে: তিনি চাঁদে প্রবেশ করেছেন, তাই তারা ইবাদতের সময় তার দিকে মুখ করে, বরং চাঁদ নিজেই আলি। তাদেরকে শিমালিয়্যাহ বলা হয়।

কেউ বলে: তিনি সূর্যে প্রবেশ করেছেন, তাই তারা ইবাদতের সময় তার দিকে মুখ করে, বরং সূর্য নিজেই আলি। তাদেরকে কালাযিয়াহ বলা হয়।[1]

এ কারণে নুসাইরি মাদ্রাসার জনৈক পরিচালক আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মহাকাশচারীগণ চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করেছে শুনে বলেন: "তারা যা বলেছে, যেমন চাঁদ জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত, যদি তাই সত্য হয়, তাহলে দীনকে সালাম (গুড বাই)। চাঁদ সম্পর্কে এসব তথ্য উদ্ঘাটনের ফলে সে তার রবের উপর চটে তিরস্কার করে বলেছে: "এখন দীনের কর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে, যেহেতু এসব আবিষ্কার প্রমাণ করেছে দীন হচ্ছে মিথ্যার ফুলঝুরি"।[2]

এসব ঘটনা প্রকৃত মুসলিমের অন্তরে কোনো প্রভাব ফেলে না, যদিও মানুষ নক্ষত্রের পর নক্ষত্র জয় করতে থাকে। তার কথা: এসব আল্লাহর কুদরত, তাদের ক্ষমতা বলে নয়। সে রাগান্বিত

---

[1] "আল-আলাবি": (পৃ.৫৭)

[2] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য (معركة في القمر) প্রবন্ধটি পড়ুন, উস্তাদ আবুল হায়সামের লিখিত। .٤٣-٣٧الإسلام في مواجهة الباطنية ص থেকে সংগৃহীত।

হয় না। কারণ সে জানে তার রব জগত ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি প্রত্যেক বস্তুতে বান্দাদেরকে যে পরিমাণ ইচ্ছা কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেন।

“আল-হাফতুশ শরিফ”এর লেখক বলেন: “এমন কোনো মুমিন নেই মারা যাওয়ার পর যার রূহ ইমাম আলির নিকট পেশ করা হয় না এবং তিনি তাকে যাচাই করেন না। যদি সে পরিক্ষিত ও খালেস মুমিন প্রমাণিত হয়, ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে আসমানে উড্ডয়ন করেন ও জান্নাতের নিকটে বিদ্যমান নহরে গোসল দেন, যার নাম “আইনুল হায়াত”।[1]

তিনি ইমামদের থেকে বর্ণনা করেন: “আমরা ইমাম, আল্লাহর অলি। আল্লাহর আসমান ও জমিনে কোন ইলম আমাদের থেকে গোপন নয়। আমরা আল্লাহর হাত ও বাহু, আমরা তার চেহারা ও চোখ। মুমিনগণ যে দিকে দৃষ্টি দিবে আমাদেরকে দেখতে পাবে। আমরা চাইলে আল্লাহ চান। আল্লাহর পরিবার ব্যতীত তুমি কোথাও তার সাক্ষাত পাবে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি স্বীয় কুদরতের পবিত্র মাটি থেকে আমাদেরকে বাছাই করেছেন এবং আমাদেরকে তার ইচ্ছার রহস্য দান করেছেন...”[2]

---

[1] আল-হাফতুশ শরিফ: (পৃ.৮২)

[2] আল-হাফতুশ শরিফ: (পৃ.১৯৭)

তাদের দোয়া ও অযিফাসমূহে আলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে "ইলাহ" হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে, যা বিবেক বর্জিত। তাদের নিকট এসব অযিফা "সূরা" নামে পরিচিত। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি সূরা দেখুন:

তৃতীয় সূরায় এসেছে: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, হে আমার মাওলা, হে আমিরে নাহাল! হে আলি, হে মহান, হে অনাদি, হে একক সত্তা, হে চিরন্তন। হে আলি, হে বড়, হে বড়দের বড়। হে সূর্য ও উজ্জ্বল চাঁদ সৃষ্টিকারী, হে আলি, দীনের অগ্রপথিক, হে জ্ঞানী ও সবজান্তা। হে বৃদ্ধদের উপর করুণাকারী, হে বাচ্চাদের লালনকারী। হে পঙ্গুহাড় সংযোজনকারী, হে বিনা কষ্টে প্রত্যেক বস্তুতে বিচরণকারী, কল্যাণের জ্ঞানের অধিকারী ও তার থেকে বঞ্চিতকারী। আবু দিহইয়ার[1] উপর পতিত হোক আল্লাহর উপযুক্ত শাস্তি। আবু সাইদের উপর সালাম ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক"।[2]

"সূরাতুস সুজূদে" এসেছে: "হে আলি, আমার মলিন ও মরণশীল চেহারা আপনার সম্মানিত, চিরঞ্জীব ও চিরঅক্ষয় চেহারার নূরের

---

[1] তার নাম: আবু দিহইয়াহ ইসমাইল ইব্‌ন খাল্লাদি। তিনি বেশ কিছু বিষয়ে নুসাইরিদের সাথে মত বিরোধ করেছেন। দেখুন: "আল-ইসলাম ফি মুওয়াজাহাতিল বাতিনিয়্যাহ" (পৃ.২৫০)

[2] "আল-জাইলুত-তালি": (পৃ.৭৯)

প্রতি সেজদাবনত... হে আলি আপনার জন্য উলুহিয়্যাত, হে আলি আপনার জন্য উর্ধ্বজগত, হে আমার মাওলা আলি, আমরা আপনার ইবাদত করি"।[1]

"সূরাতুল ইশারাতে" এসেছে: "আল্লাহর ইচ্ছা, ইজ্জত ও ইশারা তোমার জন্য হে আমার মাওলা, হে আমিরুল মুমিনীন, হে আলি, হে আনজা, হে মোটা পেটের অধিকারী, হে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাড্ডিকে জীবিতকারী। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, হে আমার মাওলা, হে আমিরুল মুমেনীন, আমাদেরকে আপনার উপার্জনকারী, গণিমত হাসিলকারী, সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনার ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুতাপী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না"।[2]

সন্দেহ নেই তারাই ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুতাপের উপযুক্ত। তারা যদি সামান্য বিবেকের অধিকারী হত, তাহলে আলিকে ইমাম ও ইলাহ উভয় জ্ঞান করত না।

"আস-সূওয়ার আল-কাবিরাতে" এসেছে: "আল্লাহর সাথে আমার প্রথম পরিচয় হচ্ছে যে, আমি পরিষ্কার, নির্মল, নুরানি, শুভ্র, আলাবি, হিজাবি ও মুহাম্মদি সাক্ষ্য দিচ্ছি। আমি সত্যিকার পন্থায় সঠিক সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার ও

---

[1] "আল-জাইলুত-তালি": (পৃ.৮৭-৮৮)

[2] "আল-জাইলুত-তালি": (পৃ.৯৩)

তোমার কোনো ইলাহ নেই একমাত্র আমিরুল নাহাল আলি ব্যতীত। কোন হিজাব নেই সায়্যেদ মুহাম্মদ ব্যতীত, কোন বাব নেই সায়্যেদ সালমান ব্যতীত... আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহই আলি, আমার রব, আমাকে জীবিতকারী ও মৃত্যুদানকারী। তিনি চিরঞ্জীব[1], কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না, তার হাতে রয়েছে কল্যাণ। তিনি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান, তার নিকটই আমাদের প্রত্যর্পণ"।[2]

তাদের ষোলতম সূরা "সূরাতুন নুকাবায়" ইয়াহূদিদের বিশ্বাস ও আদর্শ স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। তাতে এসেছে: "বারো নকিবের রহস্য, আটাইশ নজিবের রহস্য, চল্লিশ কুতুবের রহস্য, যাদের প্রথম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবা এবং সর্বশেষ ব্যক্তি মুহাম্মদ ইব্ন সিনান আয-যাহেরি। আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবার রহস্য, যিনি নকিবদের নকিব; মুহাম্মদ ইব্ন সিনান আয-যাহেরির রহস্য, যিনি নজিবদের নজিব; তাদের সবার রহস্যের শপথ। আল্লাহ তাদের

---

[1] তারা আলীর মৃত্যুতে বিশ্বাসী নয়। তার মৃত্যকে তারা মানবিক বস্ত্র ত্যাগ করা বলে। যে মানবিক বস্ত্র থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে আব্দুর রহমান ইব্ন মুলজিম। এ জন্য তারা আব্দুর রহমান ইব্ন মুলজিমকে সম্মান করে ও তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

[2] "আল-জাইলুত তালি": (পৃ.৯৯)

সবাইকে আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিনের বরকতে দুনিয়া ও দীনের চার ভূ-খণ্ডে সৌভাগ্যশীল করুন”।[1]

এ ছাড়া আরো অনেক রূপকথা, কল্পকাহিনী ও সূরা রয়েছে, যাতে এরূপ কুফরি, অপরাধ ও বিকৃতিতে পরিপূর্ণ, যার সাথে বিবেক ও জ্ঞানের সামান্য সম্পর্ক নেই। তাদের বোকামি গাধার বোকামিকে ছাড়িয়ে, বরং সকল প্রাণীর বোকামির চেয়ে নিকৃষ্ট। তারা চতুষ্পদ জন্তু থেকেও অধিক পথভ্রষ্ট।

এ জাতীয় অনেক বর্ণনা রয়েছে, দীর্ঘ হবে তাই ত্যাগ করলাম, যা থেকে স্পষ্ট হয় তাদের অগ্নিপূজারী ও নাস্তিকতা, যা নিশ্চিতভাবে সংবাদ দেয় যে, যারা নুসাইরি ধর্মের প্রবর্তক, তারা ছিল পূর্ণরূপে অগ্নিপূজক। তারা ইহুদি, নাসারা, হিন্দু সবধর্মের পণ্ডিত ছিল।

তারা আলির উলুহিয়্যাত এবং তার মধ্যে ও সকল ইমামের মধ্যে আল্লাহর প্রবেশ করার আকিদা পোষণকারী। তার একটি উদাহরণ হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা, যা আমরা ইতঃপূর্বে “আল-হাফতুশ শরিফ” থেকে বর্ণনা করেছি। সেখানে তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হুসাইন আল্লাহ, রাব্বুল আলামিন। তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে ইমামগণ নবীদের থেকে উত্তম। কারণ তাদের ধারণায় ইমামগণ আল্লাহর সাথে বিনা পর্দায় কথা বলেন, আর নবীগণ কথা বলেন পর্দার আড়াল থেকে।

---

[1] “আল-জাইলুত-তালি”: (পৃ.১০৯)

তারা এসব ভ্রান্ত মতবাদ আমদানি করেছে শিয়া দ্বাদশ ইমামিয়াদের থেকে। তারা গ্রহণ করেছে আব্দুল্লাহ ইব্ন সাবা ইয়াহূদি থেকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে তারা ইমাম আলিকে একবার বলে ইলাহ, আবার বলে নবী। আবার আলির মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন থেকে আল্লাহর কালাম পেশ করে, তার ব্যাখ্যা দেয় জাল হাদিস দ্বারা। এসব বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্যহীনতার কারণে তাদের অধিকাংশ অনুসারী কমিউনিস্ট হয়ে গেছে।[1]

নুসাইরি সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ যখন দেখল তারা শির্ক ও কুফর যাই পেশ করে, সীমালঙ্ঘনকারী একটি গোষ্ঠী বিনা প্রশ্নে তা লুফে নেয়, তখন তারা একাধিক উলুহিয়্যাতের বিষয়টি স্বাভাবিক করে ইলাহ দাবি করল। যেহেতু তাদের ধর্মে রয়েছে আল্লাহ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন বান্দার মধ্যে প্রবেশ করেন, তাই তাদের জন্য ইলাহ দাবি করা সহজ ছিল।

নিকট অতীতে "ফ্রান্স" যখন শামের উপনিবেশ ছিল, তাদের এক ব্যক্তি উলুহিয়্যাত দাবি করে। ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে

---

[1] "তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ: (পৃ.৪৬-৫০), আমরা সামান্য পরিবর্তন করে এখানে উদ্ধৃত করেছি। আরো দেখুন: নওবখতি রচিত "ফিরাকুশ শিয়াহ": (পৃ১১৬), "আল-আলাবিউন": (পৃ.১৫, ৪৪, ৫২), ড. মুহাম্মদ আহমদ আল-খতীব "আল-হারাকাতুল বাতেনিয়্যাহ ফিল আলামিল ইসলামি" গ্রন্থের দ্বিতীয় ফসলে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন: (পৃ. ৩৪১-৩৫৪)

মূর্খতা ছড়িয়ে যে কোনো মূল্যে ইসলামকে ধ্বংস করা, যেন দীর্ঘ সময় তারা মুসলিম দেশে শাসন করতে সক্ষম হয়। এ লক্ষ্যে তারা সিরিয়ার নুসাইরি সম্প্রদায় থেকে সালমান আল-মুরশিদকে বেছে নেয়। তারা তাকে উলুহিয়্যাতের মর্যাদা দেয় ও আল্লাহ তাকে পরিচ্ছদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন প্রচার করে। নুসাইরি সম্প্রদায়ের অনেকে তার প্রতি ঈমান আনে ও তার অনুসারী হয়।

একটি হাস্যকর ঘটনা: সালমান আল-মুরশিদের জীবনী লেখকগণ উল্লেখ করেছেন, সে তার পরিধেয় বস্ত্রে বৈদ্যুতিক বোতাম ব্যবহার করত, পকেটে রাখত ছোট একটি ব্যাটারি, যার সাথে বোতামের সংযোগ দেয়া ছিল। যখন সুইচ টিপ দিত, বোতামগুলো জ্বলে উঠত আর ভক্তরা কারামাত মনে করে তার পায়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।

আরেকটি মজার ঘটনা: তার উলুহিয়্যাত দাবি করার পশ্চাতে ফ্রান্সের জনৈক ব্যক্তি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিল। অন্যান্য সেজদাকারীদের সাথে সেও সালমান আল-মুরশিদকে সেজদা করত এবং তাকে সম্বোধন করত: "হে আমার ইলাহ" বলে।

ইলাহ দাবি করার পর প্রভুর দায়িত্ব হচ্ছে রাসূল প্রেরণ করা। তাই সে এক ব্যক্তিকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করল, যার নাম সালমান আল-মিদাহ। সালমান আল-মিদাহ হিমসের এক বাগানে উটের রাখাল ছিল। ইলাহ দাবি করার পূর্বে সালমান আল-মুরশিদ

ছিল গরুর রাখাল। ইলাহ গরুর রাখাল আর রাসূল উটের রাখাল, এ হচ্ছে তাদের ধর্ম। ড. হালবি অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

আবুল হায়সাম বলেছেন: "মুরশিদিয়া গ্রুপ একটি সময় পার করেছে, যখন "লাটাকিয়া"[1] অঞ্চলের প্রত্যেক মানুষের গর্দানের উপর ছিল ফ্রান্সের ক্ষমতার হাতিয়ার। অর্থাৎ **১৯৩৮ই.** সনের ঘটনা। তখন উলুহিয়াতের দাবিদার সালমান সেখানে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অপর রাষ্ট্রের ঘোষণা দেন। তিনি সেখানে ফসলাদির উপর বাৎসরিক খাজনা, ট্যাক্স ও বিচারক নিয়োগ দেন। ফাঁসির নির্দেশ জারিসহ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার কাজ তিনি নিজ উদ্যোগে করেন...।[2]

আবুল হায়সামের ভাষায় **১৯৩৮ই.** সনে ফ্রান্স যখন লাঞ্ছনার নৌকায় চড়ে সিরিয়া প্রস্থান করে, তখন তারা "সালমান"-দেরকে অনেক অস্ত্র দিয়ে যায়, যা তাদেরকে স্বৈরাচারী আচরণ ও সীমালঙ্ঘনে প্রলুব্ধ করে। তখন সিরিয়ার সরকার মুহাম্মদ আলি আজমা এক অভিযান পরিচালনা করে তার কতিপয় অনুসারীদের

---

[1] "লাটাকিয়া" জনসংখ্যার দিক থেকে সিরিয়ার পঞ্চম বৃহত্তম শহর, আলেপ্পো, দামেস্কাস, হোমস ও হামা শহরের পর লাটাকিয়াহ-ই সিরিয়ার সবচেয়ে বড় শহর। বন্দর নগরী হিসেবে সিরিয়ার প্রধান শহর। ভূ-মধ্য সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আরবি নাম: اللاذقية অনুবাদক।

[2] দেখুন: "আল-ইসলাম ফি মুওয়াজাহাতিল বাতেনিয়্যাহ": (পৃ.১০৩)

হত্যা করেন, এবং অনেকের সাথে তাকে বন্দি করেন। অতঃপর ১৯৪৬ই. সনে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেন।

তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: তুমি ইলাহ, আবার আগাখানও ইলাহ, তাহলে এক পৃথিবীতে দুই ইলাহের রাজত্ব সম্ভব কিভাবে? সে উত্তর দিল: "সৃষ্টিকর্তা তার রূহ যার মধ্যে ইচ্ছা অনুপ্রবেশ ঘটান। তিনি অতিসত্বর তার সৃষ্টিজীব থেকে একশ' মখলুকের মধ্যে এ রূহ অনুপ্রবেশ ঘটাবেন, ফলে তারাও আমার মত রব হবে"।[1]

আবুল হায়সাম তার সম্পর্কে বলেন: "সালমানের বিষয়টা খুব হাস্যকর ছিল, সে কখনো তার কর্তৃত্বের বাইরে উলুহিয়্যাতের দাবি করে নি। সিরিয়ার সংসদে তাকে তার এলাকার প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল, কিন্তু তার অনুসারীরা যা বলে, তার থেকে সে বিষয়ে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো ঘোষণা তখন শোনা যায় নি। একদা আমি তার সাথে দেখা করে তার দাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, যা তার নামে প্রচার করা হয়। তিনি কঠিনভাবে তা অস্বীকার করেন এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

সেদিন সে আমাকে বলে: তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা হচ্ছে তার অনুসারী সবাইকে ইসলামের মূলনীতির উপর পরিচালিত করা। এরপর সে কয়েকটি সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করল, যার

[1] "আল-আলাম" লিযযারকালি: (৩/১০৩)

ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করা চলে না... তবে এ ব্যক্তি এতটুকু বুদ্ধি রাখত যে, সে কখনো তার দলের বাইরে কোন বুদ্ধিমানের নিকট উলুহিয়্যাতের দাবি করত না"।[1]

তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীরা তার ছেলে মুজিবুল আকবরকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে। তাকেও হত্যা করা হয়, কিন্তু তার অনুসারীরা তাকে ইলাহ জ্ঞান করা থেকে পিছপা হয় নি। তাদের বোকামি ও মুসলিম মনীষীদের প্রতি তাদের ক্ষোভ যে, তারা স্ব স্ব পশু কুরবানির সময় বলে: আমার পক্ষ থেকে আবু বকর ও ওমরের গর্দানের পরিবর্তে মুজিবে আকবর এর নামে কুরবানি করছি। এ জন্য কোনো মুসলিম যখন তাদের এলাকা দিয়ে অতিক্রম করে, তাদের যবেহকৃত পশু তার খাওয়া হালাল নয়।

অনেক আলেম বলেন: এখনো তারা মুজিবের কোনো এক ভাইকে ইলাহ হিসেবে জ্ঞান করে। সালমান মুরশিদের পরিবার এখনো মূর্খ নুসাইরিদের মধ্যে প্রভুত্বের নেতৃত্ব দেয়।[2] তারা নিজেদের মুরশিদিয়াহ ধর্মের অনুসারী দাবি করে। আবুল হায়সাম বলেন: মুরশিদিরা এখনো সালমান ও তার সন্তানদের প্রভুত্বের আকিদা ত্যাগ করে নি, যাদেরকে তাদের পিতা [সালমান] প্রভুত্বের জন্য

---

[1] "ইসলাম ফি মুওয়াজাহাতিল বাতেনিয়াহ": (পৃ.১০৩-১০৪)

[2] "ইসলাম বেলা মাজাহেব": (পৃ.৩০৯), "তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ" থেকে সংকলিত।

তৈরি করে গেছেন। তাদের জন্য তিনি আল্লাহর কতক নাম ঘোষণা দিয়েছেন, যেমন: (ফাতেহ, সামী ও মুজিব)।[1]

প্রত্যেক মুরশিদি মত প্রকাশের স্বাধীনতার আড়ালে নিজেদের আকিদা সংরক্ষণ করে। তাদের সালাতের নাম সালাতুল মুরশিদিয়াহ, যা তারা মুজিবুল আকবরের দিকে সম্পৃক্ত করে। তারা সালাতে বলে: 'আমাদের অযিফা আমাদের মাওলার জন্য, যিনি মহান প্রভু সালমান আল-মুরশিদর সন্তান মুজিব'।

"হে আমাদের মাওলা, তোমার জন্য সম্মান, ইজ্জত, তাসবীহ ও তাকবীর। হে আমাদের রব, তুমি পবিত্র, তুমি দয়াময় ও অনুগ্রহশীল। হে আমাদের মাওলা, হে মুজিবুল মুরশিদ। তোমার জন্য পবিত্রতা, তুমি মহান রব..." তাদের এসব দোয়ায় স্পষ্ট যে, তারা নিজেদের গড়া রবকে স্মরণ করে। আল্লাহ তাদের সালাত ও অযিফা থেকে পবিত্র, মহান ও উর্ধ্বে।

নুসাইরিরা দোয়ায় বলে ও বারবার উচ্চারণ করে: হে আল্লাহ আমাদেরকে এমন সৈন্য দ্বারা রিজিক দান করুন, যারা অপরিচিত ও পরদেশ থেকে আগত, যারা মুসলিম শাসকদের থেকে আমাদেরকে মুক্ত করার জন্য পশ্চিম থেকে আগমন করে।

ড. মুস্তফা সাক'আ তাদের দোয়ার এসব ইঙ্গিত প্রসঙ্গে বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য উপনিবেশ ফ্রান্স, কারণ তারা তাদের

---

[1] আল-ইসলাম ফি মুওয়াজাহাতিল বাতেনিয়্যাহ: (পৃ.১০২)

সাহায্যকারী।[1] আবুল হায়সাম বলেন: “মুরশিদিয়া সম্প্রদায় লাটাকিয়া এলাকার আমেরিকান প্রোটেস্টেন্ড সম্প্রদায়ের গভীর বন্ধু। এর পশ্চাতে রয়েছে, রাজনৈতিক হাত, বরং বিশ্ব জায়নবাদের হাত”।[2]

দ্বিতীয় আকিদা: পুনর্জন্মে বিশ্বাস:

নুসাইরিয়া সম্প্রদায়ের আকিদার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পুনর্জন্মে বিশ্বাস করা। তারা এ বিশ্বাসের অন্তরালে কিয়ামত, পরকাল, প্রতিদান ও হিসান-নিকাশ অস্বীকার করে। আল্লামা নওবখতি পুনর্জন্মে বিশ্বাসীদের নিকট তার অর্থের বর্ণনা দিয়ে বলেন: “পুনর্জন্মে বিশ্বাসীরা এ দুনিয়ায় বারবার জন্ম নেয়ার আকিদা পোষণ করে, তাদের নিকট কিয়ামত, পুনরুত্থান ও হিসাব বলতে কিছু নেই। দুনিয়া ব্যতীত অন্য কোনো জগত নেই। কিয়ামত হচ্ছে রূহের শরীর থেকে শরীরে স্থানান্তর হওয়া। ব্যতিক্রম শুধু ভালো হলে ভালো, আর খারাপ হলে খারাপ শরীরে প্রস্থান করা। তারা পার্থিব শরীরেই নিয়ামত ভোগ করে বা শাস্তি পায়। তাদের

---

[1] দেখুন: ইসলাম বেলা মাজাহেব: (পৃ.৩০৯), মুহাম্মদ আল-মাজযুব লিখিত: "إخواننا في جبال اللاذقية" গ্রন্থ থেকে নেয়া।

[2] দেখুন: الإسلام في مواجهة الباطنية (পৃ.১০৩)

নিকট শরীরই জান্নাত বা জাহান্নাম। তারা সুন্দর, সুখী ও ভালো শরীরে প্রস্থান করে শান্তি পায়; আর কুৎসিত, দুঃখী ও খারাপ শরীরে প্রস্থান করে শাস্তি ভোগ করে, যেমন কুকুর, শূকর, সাপ, বিচ্ছু ও গুবরেপোকা। তারা এক শরীর থেকে অপর শরীরে প্রস্থান করে শাস্তি ভোগ করে। এভাবে চিরজীবন শরীরই তাদের জান্নাত বা জাহান্নাম, এ ছাড়া কিয়ামত, পুনরুত্থান, জান্নাত, জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। নেক আমল, বদ আমল, ইমামদের অস্বীকার করা ও গুনাহের পরিমাণ বিচারে রূহসমূহের পরবর্তী শরীর নির্ধারিত হয়”।[1]

নুসাইরিদের বিশ্বাস অনুযায়ী পুনর্জন্মের চারস্তর। তাদের তথাকথিত ঈমান থেকে কাছে বা দূরে অবস্থানজনিত ত্রুটি, ইমামদের আনুগত্য ও নাফরমানির উপর ভিত্তি করে প্রতিটি স্তর নির্ধারিত হয়। চারটি স্তর: নাসখ, মাসখ, ফাসখ ও রাসখ।

১. নাসখ: অর্থাৎ এক ব্যক্তির শরীর থেকে অপর ব্যক্তির শরীরে রূহের প্রস্থান করা।

২. মাসখ: অর্থাৎ মানুষের শরীর থেকে জানোয়ারের শরীরে রূহের প্রস্থান করা।

৩. ফাসখ: অর্থাৎ মানুষের শরীর থেকে জমিনে বিচরণকারী কীটপতঙ্গ ও বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের শরীরে রূহের প্রস্থান করা।

---

[1] দেখুন: “ফেরাকুশ শিয়াহ”: (৫৭, ৫৮)

৪. রাসখ: অর্থাৎ মানুষের শরীর থেকে গাছ-পালা, উদ্ভিদ ও জড়বস্তুর দেহে রূহের প্রস্থান করা।[1]

উল্লেখ্য যে, নুসাইরিদের কতক বর্ণনায় রয়েছে, মাসখ, ফাসখ ও রাসখ কোনো নুসাইরিকে স্পর্শ করে না, বরং তাদের বিপরীতে যারা রয়েছে, তাদের দৃষ্টিতে যারা কাফের, তারা এ দুনিয়ায় বারবার জন্ম নিয়ে এসব শাস্তি ভোগ করে।

"আল-হাফতুশ শরিফে" পুনর্জন্মের বিভিন্ন পদ্ধতি ও শাস্তি ভোগের নানা অবস্থার বর্ণনা রয়েছে, তাদের নিকট কাফেররা যা একরূহ থেকে অপর রূহে প্রস্থান করার সময় ভোগ করে। দীর্ঘ হবে তাই এখানে তার উল্লেখ ত্যাগ করলাম।

"আল-হাফতুশ শরিফে" এসেছে: "আপনার সাথে কোনো ব্যক্তি সশরীরে সাক্ষাত করে, আপনি তাকে ভাবেন মানুষ, অথচ সে [ভবিষ্যতে পুনর্জন্মের বিচারে] বানর, অথবা শূকর, অথবা কুকুর অথবা জমিনে বিচরণকারী কোন কীট"।[2]

মুফাদ্দাল বলেন: "আমি আমাদের মাওলা সাদিককে জিজ্ঞাসা করেছি, অলি ও তাদের শত্রুদের মধ্যে ভালো-মন্দ যে সম্পর্ক থাকে, পরবর্তীতে তার বিনিময় হবে কিভাবে, শত্রুদেরকে অলিদের ছাড়া কেউ শাস্তি দিবে, কিংবা অলিদেরকে শত্রুদের

---

[1] দেখুন: "তায়েফাতুন নুসাইরিয়া": (পৃ.৮৮)

[2] দেখুন: "ফেরাকুশ শিয়াহ": (৮০)

ছাড়া কেউ শাস্তি দিবে? তিনি বললেন: তুমি জান না মুমিনগণ থাকে নাসুতে, আর কাফেররা থাকে মাসুখিয়ায়। বারবার পুনর্জন্মে একটি পর্যায় আসে, যেখানে একে অপরের প্রতি ভালো কিংবা খারাপ আচরণ করতে সক্ষম হয়, যেমন তারা একে অপরের প্রতি করেছে, ভালো হলে ভালো, আর খারাপ হলে খারাপ"।[1]

মানুষকে কুকুরের দংশন করা ও কষ্ট দেয়ার কারণ সম্পর্কে বলেন: "ব্যক্তি যখন কোন কুকুরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, কুকুরটিকে সে চিনে না, হয়তো ইতঃপূর্বে কখনো দেখেনি, বা সে কুকুরের স্ত্রীকে বিয়ে করেছে। কারণ এক সময় সে মানব আকৃতিতে ছিল, মানুষের ন্যায় তার সব ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে যবেহ বা হত্যার মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন, যা তার দুনিয়ার কর্মের ফল। ব্যক্তিটি তার অবর্তমানে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেছে, তার বাড়িতে বসবাস করছে, তার কাপড় পরিধান করছে, যা কুকুর মাসুখিয়া অবস্থায় থেকে চিনতে পারে। অতএব যখন সে তাকে দেখে, তার উপর হামলা করে বা তাকে কামড় দেয়"।[2]

প্রত্যেক আদম ও তাদের সন্তানদের মৃত্যু সম্পর্কে বলেন: "যখন আদম ও তার সন্তানদের বয়স শেষ হয়, তারা দলে দলে বিভক্ত

---

[1] দেখুন: "ফেরাকুশ শিয়াহ": (৩৬)

[2] দেখুন: "ফেরাকুশ শিয়াহ": (পৃ.১২০, ১২১)

হয়, একদল হয় আহলে মাসখ, তারা শাস্তি প্রাপ্তদল। অপর দল হয় আহলে নাসখ, তারা সাওয়াব প্রাপ্তদল”।[1]

অধিকাংশ মানুষ নাসখ ও ফাসখের শিকার হয়, বিশেষ করে তাদের সর্বশেষ চক্রে। “অর্থাৎ প্রত্যেক আদম ও তার সন্তানগণ সর্বশেষ চক্রে নাসখ ও মাসখের শিকার হন। আর এ সর্বশেষ চক্র থেকেই আমাদের পিতা অষ্টম আদম ও তার সন্তানগণের সৃষ্টি।” তারা এরূপ অসার কল্পকাহিনীতেই বিশ্বাস করে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “এমন কোনো পাখি নেই, যার মাতা, পিতা, চাচা ও মামা নেই। অতঃপর আবুল হাসান জনৈক কাঠমিস্ত্রির দিকে তাকিয়ে বলেন, যে নিজ ঘরের কাজে মগ্ন ছিল: এ কাঠমিস্ত্রি প্রথম চক্রে মোরগ ছিল, বর্তমান সে কাঠ মিস্ত্রি”।[2]

বিকৃত মস্তিষ্কের ভাবনা, কল্পকাহিনী ও নিরেট বোকামি তুল্য এ জাতীয় আরো সংলাপ রয়েছে তাদের ধর্মে, যা তারা সংগ্রহ করেছে অগ্নিপূজক মূর্তিপূজকদের থেকে।

তৃতীয় আকিদা: তাদের আকিদায় মদ পবিত্র বস্তু। তাদের বিশ্বাস আল্লাহ তাতে বিকশিত হন। এ জন্য তারা আল্লাহর সম্মানার্থে

---

[1] দেখুন: “ফেরাকুশ শিয়াহ”: (পৃ.১৫১)

[2] দেখুন: “ফেরাকুশ শিয়াহ”: (পৃ.১৮১)

মদকে “আব্দুন নূর” বলে। তাই মদের উৎস আঙুরের গাছকাটা তাদের নিকট বড় অপরাধ।

অষ্টম অধ্যায়

নুসাইরিদের ইবাদত:

নুসাইরিরা মুসলিমদের ইবাদতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে, বরং প্রত্যেক বিষয়ে। এটাই স্বাভাবিক, কারণ ইসলামি শিক্ষা কখনো মূর্তিপূজকদের শিক্ষার ন্যায় হতে পারে না, ইসলামি নাম ব্যবহার করেই মুসলিম হওয়া যায় না। অধিকন্তু তারা খ্রিস্টানদের নামও ব্যবহার করে, আমরা পূর্বে তা বলেছি। আশ্চর্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ সাহাবি আবু বকর ও ওমরের নাম তারা কখনো গ্রহণ করে না।

আমরা পূর্বে বলেছি নুসাইরিদের মাযহাব বিভিন্ন মতবাদ ও ধর্ম থেকে সংকলিত। তাদের কিতাবে বিদ্যমান সালাত, হজ, যাকাত ও সিয়াম কখনো ইসলামি শরিয়তের সালাত, হজ, যাকাত ও সিয়াম নয়, বরং এসব নাম তারা বিভিন্ন বাতেনি অর্থে ব্যবহার করে।

কতিপয় আলেম উল্লেখ করেছেন, নুসাইরিরা দীনি বিধানের ক্ষেত্রে আলেম ও জাহেলদের মধ্যে পার্থক্য করে, তাদের দৃষ্টিতে কঠিন ইবাদত শুধু আলেমদের জন্য, সাধারণ জনগণের জন্য নয়।

এ বর্ণনার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে,[1] কারণ মাশায়েখ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বাতেনি বিষয় জানেন, তাই তারা স্বাধীন। তাদের থেকে ধর্মীয় বিধান রহিত হয়ে যায়, যেমন অন্যান্য বাতেনি ধর্মের অবস্থা। তারা ধারণা করে ব্যক্তি যখন বাতেনি অর্থ জানে, তার থেকে বাহ্যিক বিধান ও হালাল-হারাম রহিত হয়ে যায়।

এ কথা ঠিক যে, তাদের মাযহাবে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী হতে কতক অযিফা দেয়া হয়, যা পরবর্তীতে প্রয়োজন হয় না। "আল-হাফতুশ শরিফে" অনুরূপ বলা হয়েছে। সেখানে নুসাইরিদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, "ইস্তফা"-র স্তর নবীদের উপরে। এ স্তরের উপর রয়েছে হিজাবের স্তর। অতঃপর মুফাদ্দাল আল-জু'ফি বলেন:

"আমি বললাম, হে আমার মাওলা এসব স্তর জানা কি আমাদের জন্য জরুরি"। সাদেক বললেন: হ্যাঁ, যে এসব বাতেনি জ্ঞান হাসিল করে তার থেকে বাহ্যিক আমল রহিত হয়ে যায়। এসব বাতেনি স্তর যে জানে না, তার জন্য বাহ্যিক আমল জরুরি। আর যে জানে, একএক স্তর অতিক্রম করে, তার থেকে ইবাদত রহিত

---

[1] বরং এর বিপরীত সঠিক, অর্থাৎ মূর্খদের সব ইবাদত করতে হয়, জ্ঞানীদের থেকে অনেক ইবাদত রহিত হয়ে যায়। যার বর্ণনা সামনে আসছে। অনুবাদক।

হয়ে যায়। সে তার সাধনা ও জ্ঞানের কারণে দাসত্বের সীমানা পেরিয়ে স্বাধীনতার সীমানায় পদার্পন করে।

আমি বললাম: হে আমার মাওলা, এ কথা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তুমি আল্লাহর বাণী শ্রবণ কর নি:

﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلۡمُنتَهَىٰ ۝٤٢ ﴾ [النجم : ٤٢]

“আর নিশ্চয় তোমার রবের নিকটই হলো শেষ গন্তব্য”।[1] ব্যক্তি তার রবের মারেফত হাসিল করতে সক্ষম হলে উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছে। তাওহীদ ও জ্ঞান ব্যতীত কোন বস্তু আল্লাহর অধিক নৈকট্যে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। যারা আমলে ত্রুটি করে তাদের জন্য রয়েছে পায়ের বেড়ি ও গলার শিকল। যে এ স্তরগুলো জানে ও তাতে উন্নীত হয়, যা আমি তোমাকে শুনিয়েছি, সে নিজের গর্দানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করল। তার থেকে পায়ের বেড়ি, গলার শিকল ও বাহ্যিক আমল রহিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করলেন:

﴿ لَيۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٞ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحۡسَنُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ۝٩٣ ﴾ [المائدة: ٩٣]

---

[1] সূরা আন-নাজম: (৪২)

“যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা যা আহার করেছে তাতে কোন পাপ নেই, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে আর নেক আমল করে, তারপর তাকওয়া অবলম্বন করে ও ঈমান আনে। এরপরও তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন”।[1] আমার মাওলা পড়লেন:

﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَٰعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٢٩ ﴾ [النور : ٢٩]

“যে ঘরে কেউ বাস করে না, তাতে তোমাদের কোন ভোগসামগ্রী থাকলে, সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর”।[2] আমি বললাম: হে আমার মাওলা এ থেকে আপনার উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন: জ্ঞানে উন্নতি হলে মর্যাদার স্তরেও উন্নতি হয়।[3]

---

[1] সূরা আল-মায়েদা: (৯৩)

[2] সূরা নূর: (২৯)

[3] দেখুন: “আল-হাফতুশ শরিফ”: (পৃ.৪২) ও (পৃ.১২৫)

ড. মুস্তফা সাক‘আ লিখেন[1]: নুসাইরিগণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, কিন্তু তা আদায়ের পদ্ধতি, রাকাত সংখ্যা ইসলামি যে কোনো মাযহাব থেকে ভিন্ন। তাদের সালাতে সেজদা নেই, কখনো কয়েকটি রুকু থাকে।

তারা জুমার সালাত ত্যাগ করে ও তার ফরয হওয়া অস্বীকার করে। তারা সালাতের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করে না। তারা মসজিদে সালাত আদায় করে না, বরং মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করে। তারা ঈদ নাম দিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে একটি সময়ে সমবেত হয়। এতে দাঁড়িয়ে আলেমরা ইমামদের সম্পর্কে কতিপয় কিচ্ছা, ঘটনা ও বানোয়াট মু‘জিযার বর্ণনা দেন। এসব মজলিসে পুরুষ-মহিলা ভালো-খারাপ সবাই একসাথে জমায়েত হয়।

অতঃপর তারা কতিপয় দীনি অনুষ্ঠানে যোগ দেন ও সালাত আদায় করেন, যা নাসারাদের দীনি অনুষ্ঠান ও ইবাদতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাদের পবিত্র অনুষ্ঠানের অন্যতম হচ্ছে, কাদ্দাসুত তাইয়্যেব লি কুল্লি আখিন ওয়া হাবীব, কাদ্দাসুল বুখূরি ফী রূহে মা ইয়াদূরু ফী মাহাল্লেল ফারাহে ওয়াস সূরূর, কাদ্দাসুল আযান। প্রত্যেক কাদ্দাস অনুষ্ঠানের জন্য তাদের নির্দিষ্ট অযিফা ও দোয়া রয়েছে। তারা তাদের ঘরে বরকত ও দুশমনের উপর জয়ী

---

[1] দেখুন: “ইসলাম বেলা মাজাহেব”: (পৃ.৩১২), “তায়েফাতুন নুসাইরিয়া” থেকে সংগৃহীত।

হওয়ার জন্য ইলাহ আলি, পাঁচ আইতাম ও বিখ্যাত জ্ঞানীদের দ্বারা অসিলা তালাশ করে, যাদেরকে তারা আল্লাহ ব্যতীত রব বানিয়ে নিয়েছে, যেমন খুসাইবি ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। তাদের পবিত্র আযানের উদাহরণ:

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا وجهت وجهي إلى محمد المحمود طالبا سره المقصود، المتقرب بتجلي الصفات وعيني الذات، وفاطر ذو الجلال، والحسن ذو الكمال، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم الخليل، هو الذي سماكم مسلمين حنيفا مسلما ولاأنا من المشركين.

আমার দীন অবিনশ্বর। আমি স্বীকার করছি যেমন স্বীকার করেছেন সায়্যেদ সালমান, যখন মুয়াজ্জিন তার কানে আযান দিয়েছিল ও বলেছিল: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, উপাস্য আলি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ মাহমুদ ব্যতীত কোনো সায়্যেদ নেই, সায়্যেদ সালমান ফারেসী ব্যতীত কোনো বাব নেই এবং পঞ্চ আইতাম ব্যতীত কোনো ফেরেশতা নেই।

আমাদের শায়খ, আমাদের সায়্যেদ হুসাইন হামদানি আল-খুসাইবি ব্যতীত কোনো রব নেই। তিনি নাজাতের তরী ও জীবনের সঞ্জীবনী। হে মুমিনগণ তোমরা সালাতে আস, নাজাতের দিকে আস, তাহলে সফল হবে। আস উত্তম আমলের দিকে, সত্যিকার অর্থে যা জীবন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সালাত

কায়েম হল মুমেনদের উপর, দলিল কায়েম হল সাবালগদের উপর।

আল্লাহ আমার মাওলা; হে আলি, তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, যত দিন আসমান-জমিন বিদ্যমান থাকে, তুমি তা কায়েম রাখ। তুমি সায়্যেদ মুহাম্মদকে বানাও তার মোহর, সায়্যেদ সালমানকে বানাও তার যাকাত, মিকদাদকে বানাও তার ডান হাত এবং আবু যরকে বানাও তার বাম হাত। প্রশংসাকারীদের প্রশংসা দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করছি, শোকর আদায়কারীদের শোকর দ্বারা আল্লাহর শোকর আদায় করছি। আল্লাহ দরূদ প্রেরণ করুন আমাদের সায়্যেদ মুহাম্মদ, তার পরিবার, তার সাথী ও সবার উপর।

হে আল্লাহ আপনার নিকট প্রার্থনা করছি পবিত্র আযানের উসিলায়, মাত্তা, সাম'আন[1], ইতিহাস ও বছরের উসিলায়, ইউসূফ যার সন্তানই হোক তার উসিলায়, এগারো তারকার উসিলায়[2], ইউসূফ যাদের স্বপ্নে দেখেছেন। হে আমার মাওলা, হে আলি, হে মহান তোমাদের ঘরে পূর্ণরূপে বরকত প্রবেশ করুক"।[3]

---

[1] এটা তাদের নাসারা হওয়ার প্রমাণ।

[2] এতে তাদের তারকারাজির পূজার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

[3] "আল-আলাবি": (পৃ.১০৯)

তাদের এ জাতীয় অনেক পবিত্র অযিফা ও ইবাদত রয়েছে, যা সবই নোংরা, কল্পকাহিনী ও বিকৃত মস্তিষ্কের আবিষ্কার।

“আল-হাফতুশ শরিফে” সালাত ও যাকাতের অর্থ দেখুন, জাফর সাদেক মুফাদ্দালকে বলেন: “তুমি আল্লাহর বাণীর অর্থ জান?

﴿ وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِوَٱلزَّكَوٰةِ ۝٥٥ ﴾ [مريم: ٥٥]

“আর সে তার পরিবার-পরিজনদের সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত”।[1] আমি বললাম: অর্থাৎ তার মুমিন অনুসারীগণ, যারা নিজেদের ঈমান গোপন করে, এটাই সর্বোচ্চ স্তর, মারেফত ও তাওহীদের স্বীকারোক্তি। তিনিই মহান আলি। আর আল্লাহর নিচের বাণীর অর্থ:

﴿ وَكَانَ يَأۡمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِوَٱلزَّكَوٰةِ ۝٥٥ ﴾ [مريم: ٥٥]

এখানে সালাত অর্থ আমিরুল মুমেনিন, যাকাত অর্থ তার মারেফত। ইকামাতে সালাত অর্থ আমাদের মারেফত ও আমাদের কায়েম করা”।[2]

নুসাইরিদের নিকট সিয়ামের অর্থ রমযান মাসে দিনের বেলা পানাহার ও সকল খাদ্য জাতীয় বস্তু থেকে বিরত থাকা নয়, বরং তাদের নিকট সিয়ামের সংজ্ঞা হচ্ছে পূর্ণ রমযান স্ত্রী সহবাস থেকে

---

[1] সূরা মারইয়াম: (৫৫)

[2] “আল-হাফতুশ শরিফ”: (পৃ.৪০)

বিরত থাকা। আর আল্লাহর ঘরের হজ তাদের নিকট কুফর ও মূর্তিপূজা।[1]

ড. আব্দুর রহমান বাদাবি লিখেছেন, ছোট্ট এক বইয়ে নুসাইরিদের আকিদা ও মৌলিক শিক্ষা পাওয়া যায়, যার শিরোনাম: (كتاب تعليم ديانة النصيرية) এ কিতাবটি হস্তাক্ষরে লেখা প্যারিসের স্থানীয় লাইব্রেরীতে রয়েছে, [নাম্বার:৬১৮২]। এ বইটি প্রশ্নোত্তর আকারে। তাতে এক শ একটি প্রশ্নোত্তর রয়েছে। নমুনাস্বরূপ এখানে কয়েকটি উদ্ধৃত করছি:

প্রশ্ন: আমাদের কে সৃষ্টি করেছে?

উত্তর: আমিরুল মুমেনিন আলি ইব্‌ন আবু তালিব।

প্রশ্ন: কিভাবে জান আলি আমাদের ইলাহ?

উত্তর: মিম্বারে দাঁড়িয়ে তার দেয়া বক্তব্য খুতবাতুল বয়ানে থেকেই জানি তিনি ইলাহ, তিনি সেখানে বলেছেন: "আমি সকল রহস্যের রহস্য, আমি নূরের বৃক্ষ... আমি প্রথম ও আমি শেষ। আমি বাতেন, আমি জাহির"...।

প্রশ্ন: আমাদের মাওলা আমিরুল মুমেনিনের বিভিন্ন ভাষায় কি কি নাম রয়েছে?

---

[1] "তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ": (পৃ.৬৬)

উত্তর: আরবদের নিকট তার নাম আলি। তিনি নিজের নাম রেখেছেন আরাস্তুতালিস। ইঞ্জিলে তার নাম ইলিয়া (ইলিয়াস), যার অর্থ আলি, হিন্দুরা তাকে বলে ইব্‌ন কানকারাহ...

প্রশ্ন: আমাদের মাওলাকে আমরা কেন আমিরুন নাহাল বলি?

উত্তর: সত্যিকার মুমিনগণ নাহালের মত, যারা সবচেয়ে সুন্দর ফুল থেকে মধু আহরণ করে, এ জন্য তাকে আমিরুন নাহাল বলা হয়।

প্রশ্ন: পৃথিবীর ছোট জগতে 'নুজাবা'দের নাম কি?

উত্তর: পঁচিশটি নাম রয়েছে প্রথমটি আবু আইয়ূব, সর্বশেষ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাবা।

প্রশ্ন: কুরআন কি?

উত্তর: আমাদের মাওলার মানব আকৃতিতে বিকশিত হওয়ার সুসংবাদ।

প্রশ্ন: আমাদের সত্যিকার ভাইদের নিদর্শন কি?

উত্তর: ع.م.س.

প্রশ্ন: নাওরোজের দোয়া কি?

উত্তর: মদের পাত্রকে সম্মান করা।

প্রশ্ন: পবিত্র মদের নাম কি, যা মুমিনগণ পান করবে?

উত্তর: আব্দুন নূর।

প্রশ্ন: কেন?

উত্তর: কারণ আল্লাহ তাতে বিকশিত হন।

প্রশ্ন: মুমিনগণ কেন সালাতের সময় সূর্যের দিকে মুখ করে?

উত্তর: কারণ সূর্য সকল নূরের নূর।

উক্ত কিতাবে এক শো একটি প্রশ্ন রয়েছে, আব্দুল হুসাইন আল-আসকারি তার "আল-আলাবিউন"[1] গ্রন্থে সবক'টি প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করেছেন। তার শিক্ষার সারাংশ হচ্ছে: আলি ইব্‌ন আবু তালিবের প্রভুত্ব ও উলুহিয়্যাত, পুনর্জন্ম ও মানুষের দেহে আল্লাহর প্রবেশ করার আকিদা, মদকে সম্মান করা, তারা যার নাম দিয়েছে আব্দুন নূর, কারণ আল্লাহ তাতে প্রবেশ করেন, নাসারা ও অগ্নিপূজকদের উৎসবগুলোকে সম্মান করা, তারকাদের সম্মান করা ও তাদের উপর ভরসা করা, সূর্যের ইবাদত করা, তাদের অগ্নিপূজা মূর্তিপূজা শিক্ষার রহস্য গোপন করার নানা উপদেশ।

---

[1] "আল-আলাবিউন": (৯৬), ড. বদাওয়ি লিখিত: "মাজাহেবুল ইসলামিয়্যিন" থেকে সংকলিত: (২/৪৭৪-৪৮৭)

নবম অধ্যায়

নুসাইরিদের উৎসবসমূহ:

নুসাইরিরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার ঈদ-উৎসব পালন করে, যেমন ঈদুল গাদির, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আদহা, ঈদুল আশুরা, মোবাহালার দিন ঈদুল গাদিরিস সানি, ঈদুন নওরোজ, ঈদুল মেহেরজান, ঈদুস সালিব, ঈদুল গাত্তাস, ঈদুস সা'ফ, ঈদুল উনসুরাহ, ঈদুল কাদিসাহ সেন্ট বারবারা ও ঈদুল মিলাদ ইত্যাদি। তাদের আরো ঈদ রয়েছে। তাদের এসব ঈদ মুসলিম, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজক সবার থেকে সংগৃহীত।[1]

ঈদুন নওরোজ সম্পর্কে আব্দুল হুসাইন বলেন: "ঈদুন নওরোজ পারস্যদের জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব, নুসাইরিদের মধ্যে এ ঈদ প্রমাণ করে তারা পারস্যের অগ্নিপূজকদের দ্বারা প্রভাবিত। তারা পারস্যের বাদশাহদের সম্মানে বলে, তাদের মধ্যে ইলাহ প্রবেশ করেছেন। এমন কি তারা পারসিকদের ন্যায় নিজেদের মধ্যেও ত্রিত্ববাদ কায়েম করেছে, অথচ তারা ইসলামের দাবিদার!

অর্থাৎ পারস্যের অগ্নিপূজকদের বিশ্বাস ছিল, পারস্যের তিনজন বাদশাহ হিকমতের অধিকারী ছিলেন, যাদের মধ্যে ইলাহ প্রবেশ

---

[1] ড. হালবি রচিত "তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ": (পৃ.৭১) গ্রন্থে আরো ঈদের উল্লেখ রয়েছে।

করেছেন। তারা হলেন শারউইন, কারউইন ও কিসরা (খসরু)। এর বিপরীতে নুসাইরিরা তাদের ইসলামে তিনজন সালুস (ত্রিত্ববাদ) কায়েম করেছে: আল-মা‘না, আল-ইসম, আল-বাব। অর্থাৎ আলি, মুহাম্মদ ও সালমান, যা তারা (ع.م.س) অক্ষর দ্বারা স্মরণ করে।[1]

[1] “আল-আলাবিউন”: (পৃ.১০৪, ১০৫)

দশম অধ্যায়

সাহাবিদের সম্পর্কে নুসাইরিদের অবস্থান:

ইসলামের অপরাপর শত্রুদের ন্যায় নুসাইরিরাও ইসলাম ও তার নেতৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাই সাহাবিদের প্রতি তাদের ক্ষোভের শেষ নেই, বরং তাদের বিশ্বাসে অনেক সাহাবি প্রকৃত মুমিন ছিল না, তারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করত, কিন্তু আলির ভয়ে ভেতরে নেফাক লুকিয়ে রাখত। তাদের ধারণায় এরা হল আবু সুফিয়ান ও মুয়াবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিফা আবু বকর, প্রখ্যাত সাহাবি ও তাঁর উত্তরসূরী ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে তারা বিশেষভাবে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের নিশানা বানায়। কোনো সন্তানের নাম তারা আবু বকর ও ওমর বরদাস্ত করে না। তাদের চরম পর্যায়ের বোকামি হল তারা বন-জঙ্গলের জানোয়ারদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়, এ বিশ্বাসে যে আবু বকর, ওমর ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম পুনর্জন্ম পদ্ধতিতে তাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

এ জন্য তারা খচ্চর বা গাধাকে কঠিন শাস্তি দেয়, কারণ সেগুলো আবু বকর ও ওমরের রূহ ধারণ করেছে। তারা বকরিকে শাস্তি দেয়, এ বিশ্বাসে যে মুমিনদের মা আয়েশার রূহ তাতে প্রবেশ

করেছে। এভাবে তারা নিজেদের অগ্নিপূজার ক্ষোভ নিবারণ করে। তবে এতো জানোয়ার থেকে কোনটিকে শাস্তি দেবে, এ নিয়ে তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে।

আর তাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হোক, তারা সাহাবীগণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে এমনসব কথা বলে যা সামান্যতম বিবেক ও লজ্জার অধিকারী লোকও কারও সম্পর্কে বলে না। তারা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে 'আদলাম' নামে ডাকে।
মুসলিম উম্মার শ্রেষ্ঠ সন্তান এসব সাহাবিদের ব্যাপারে তাদের গোস্বার কারণ স্পষ্ট, কারণ সাহাবীগণ অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজকদের শাসন নিঃশেষ করে পারস্য তথা ইরানে ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন। অতএব তারা সেসব সাহাবিদের প্রতি কিভাবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, যারা তাদের দীন, শাসন ও রাজত্ব নিঃশেষ করেছেন?!

একাদশ অধ্যায়

নুসাইরিদের বিভিন্ন দল-উপদল।

নুসাইরিরা নানা দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কয়েকটি নিম্নরূপ:

১- "আল-জিরানাহ":[1] তারা জিরানা জনপদে বসবাসকারী, তাই তাদেরকে "জিরানাহ" বলা হয়। অতঃপর তাদের নেতা মুহাম্মদ 'কালাযু' এর আবির্ভাবের পর থেকে তারা "আল-কালাযিয়াহ" নামে পরিচিত হয়। তাদের অপর নাম "আল-কামারিয়াহ", কারণ তারা বিশ্বাস করে আলি চাঁদে প্রবেশ করেছেন।[2] তাদের বিশ্বাস মানুষ যখন পরিচ্ছন্ন, খালেস ও নির্ভেজাল মদ পান করে, তখন সে চাঁদের নিকটবর্তী হয়।

২- "আল-গাইবিয়্যাহ": ড. হালবির সংজ্ঞা মতে: অদৃশ্য জগতে নির্ধারিত বস্তুর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তারা অসীলা ত্যাগ করেছে, তাই তাদেরকে "গাইবিয়্যাহ" বলা হয়। অথবা তারা

---

[1] বর্তমান তুরস্কের অধীন "হাতেয়া" প্রদেশের এন্টাকিয়া অঞ্চলের একটি জনপদের নাম জিরানাহ। অনুবাদক।

[2] ড. হালবি রচিত "তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ": (পৃ.৮৩) গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। আর অধিকাংশ আলেম বলেন: "আলি সূর্যে প্রবেশ করেছেন বিশ্বাসে কালাজিয়া সম্প্রদায় সূর্যের ইবাদত করে। সূর্য ও চাঁদকে সম্মান করা নুসাইরিদের সাধারণ অভ্যাস। তবে শায়েখদের অনুকরণে কখনো সূর্য আবার কখনো চাঁদের দিকে বেশী মনোযোগ দেয়।

বলেছে: আল্লাহ আলির মধ্যে বিকশিত হয়েছেন, অতঃপর মানুষের অন্তরালে চলে যান ও আত্মগোপন করেন, তাই বর্তমান যুগ হচ্ছে গাইবতের যুগ। তারা স্বীকার করে অদৃশ্য মূলত আল্লাহ, তিনি হলেন আলি। 'সাবের তু'আইমাহ' তা-ই উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে আলি হায়দার নামে জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাব হল, তখন থেকে তারা "আল-হায়দারিয়্যাহ" নামে পরিচিতি লাভ করে।

৩- "আল-মাখুসিয়্যাহ": আলি মাখুসি কালাযিয়া থেকে বের হয়ে নতুন দল গঠন করেন, যার নাম "আল-মাখুসিয়্যাহ"।

৪- "আন-নিয়াসিফাহ": নুসাইরি শায়েখ নাসের আল-হাসুরির নামে তাদের নিয়াসিফা বলা হয়, কারণ তার বাসস্থান ছিল লেবাননে অবস্থিত নিসাফ এলাকায়।[1]

---

[1] দেখুন: "তায়েফাতুন নুসাইরিয়্যাহ": (পৃ.৮৩), সাবের তায়িমাহ রচিত "দিরাসাত ফিল ফিরাক": (পৃ.৫৪,৫৫), এবং মাযাহেবুল ইসলামিয়্যিন: (৪/২৯৫)

দ্বাদশ অধ্যায়

নুসাইরিদের অবস্থান:

আব্দুল হুসাইন আল-আসকারি তাদের অবস্থান সম্পর্কে বলেন: "বর্তমান তাদের অধিকাংশ লোকের বসবাস সিরিয়ার দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলে। তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল, লেবাননের উত্তরাঞ্চল, ইরান, রাশিয়ান তুর্কিস্তান ও কুর্দিস্তানে তাদের বসবাস রয়েছে"।[1]

---

[1] "আল-আলাবিউন আও আন-নুসাইরিয়াহ": (পৃ.৭)

তেরোতম অধ্যায়

নিষ্ফল কতক প্রচেষ্টা:

মুসলিম নেতৃবৃন্দ নুসাইরিদের ইসলামে আনার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছেন, কখনো ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে, কখনো সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন দিয়ে। যখন তারা নিজেদের দুর্বলতা দেখেছে, মুসলিমদের সাথে একমত হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবে ইসলামের বিধানগুলো মেনে নিয়েছে।

যখন মুসলিমদের দুর্বলতা দেখেছে, তখন তারা আসল চেহারায় বের হয়েছে। তারা ইসলামের বিধানকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, যা তারা ইতঃপূর্বে পালন করত, যেমন মসজিদ নির্মাণ করা, জামাতের সাথে সালাত আদায় করা, রমযান মাসের সিয়াম পালন করা ইত্যাদি। তারা যেসব আমল দ্বারা মুসলিমদের ধোঁকা দিত এবং বুঝাতো যে, মুসলিম ও তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, তার সবকিছু তারা ত্যাগ করত। যেসব মুসলিম মনীষী নুসাইরিদের সংস্কার ও তাদেরকে ইসলামে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন, তাদের ক'জন নিম্নরূপ:

১- সালাহ উদ্দিন আইয়ূবি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ক্রুসেডদের তাড়িয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন, সেখানে নুসাইরিদের সালাত আদায়, সিয়াম পালন ও অন্যান্য ইসলামি আমলগুলো সম্পাদনের নির্দেশ

দেন। এ কারণে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা তার অনুসরণ করে, কিন্তু তার মৃত্যুর পর সবত্যাগ করে ও মসজিদগুলো জীব-জন্তুর আস্তাবল বানায়।

২- জাহের বাবরস। তিনি তাতারিদের হটিয়ে নুসাইরিদের গ্রামে গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করেন ও তাতে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন। তারা গ্রাম থেকে দূরে মসজিদ নির্মাণ করে পরিত্যক্ত ফেলে রাখে। অনেক সময় কোন পথিক তার পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময় যখন আযান দিত, তারা বলত: উটের ন্যায় আওয়াজ কর না, কিছুক্ষণ পরই তোমার ঘাস চলে আসছে। পর্যটক ইব্ন বতুতা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

৩- উসমানি খলিফা "সালিম"। তিনি নুসাইরি এলাকায় মসজিদ নির্মাণসহ অনেক সংস্কারমূলক কাজ করেছেন, কিন্তু তার পরে তারা পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায়।

৪- মিসরের গভর্নর ইবরাহিম পাশা ইব্ন মুহাম্মদ আলি পাশা। তিনি নুসাইরিদের বাতিল আকিদা-বিশ্বাস থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সংস্কারমূলক অনেক কাজ করেন, কিন্তু যখনি তারা নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শক্তিশালী দেখেছে, পশ্চাতে ফিরে গেছে।

৫- উসমানি সুলতান আব্দুল হামিদ। তিনি নিজের বিশেষ ব্যক্তি জিয়া পাশাকে বারবার প্রেরণ করে নুসাইরিদের হিদায়েতের চেষ্টা করেন ও তাকে লাটাকিয়া অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি

তাদের জন্য মসজিদ নির্মাণ ও মাদ্রাসা তৈরি করেন, ফলে তারা ইলম হাসিল, সালাত আদায় ও সিয়াম পালন করা আরম্ভ করে, তারা খলিফাকে বুঝায় যে, তারা মুসলিম। তারা খলিফার কোনো নির্দেশ অমান্য করে নি, কিন্তু যখন সে ক্ষমতা ত্যাগ করে তারা মাদ্রাসাসমূহ ধ্বংস করে ও মসজিদগুলো জ্বালিয়ে নাপাক করে দেয়।[1]

(ইতঃপূর্বে) শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ নুসাইরিদের হিদায়েতের জন্য অনেক আলোচনা ও যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি মুসলিমদের নিয়ে “জাবালে কাসরাওয়ান”[2] নামক

---

[1] দেখুন: ইব্‌ন বতুতা রচিত: (تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) (পৃ.৬৫), সম্পাদনায়: আহমদ আল-আওয়ামেরি ও মুহাম্মদ আহমদ যাদুল মাওলা, প্রকাশের স্থান: কায়রো। আরো দেখুন: মুহাম্মদ কুরদ আলি রচিত: (خطط الشام) (/২৬০, ২৬৩) ও (৩/১০৫), الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (পৃ.৩৩২, ৩৩৩), দেখুন: “তায়েফাতুন নুসাইরিয়াহ”: (পৃ.৬৫)

[2] “জাবালে কাসরাওয়ান” অর্থ কাসরাওয়ান পাহাড়। লেবাননের একটি প্রদেশের নাম “জাবালে লুবনান”, যার ছয়টি জেলা রয়েছে। তাতে অবস্থিত “কাসরাওয়ান” পাহাড়কে কেন্দ্র করে একটি জেলার নাম হয়েছে “কাসরাওয়ান” জেলা। সীমানা: উত্তরে জাবিল জেলা, পূর্বে বা‘লাবাক্কা জেলা ও দক্ষিণে আল-মাতন জেলা। আর পশ্চিমে ভূ-মধ্য সাগর। এ প্রদেশের রাজধানী “বাবদা”। “জাবালে লুবনান” প্রদেশ লেবাননের রাজধানী বৈরুতকে তিন দিক থেকে ঘিরে আছে: উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ, পশ্চিমে রয়েছে ভূ-মধ্য সাগর।

স্থানে তাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন ও তাদের শহর দখল করেন। অতঃপর সুলতানকে লিখে পাঠান যে, তাদের পণ্ডিতদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, যারা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করছে। তাদের এলাকায় ইসলামের বিধান কায়েম করুন ও সুন্নতের ব্যাপক প্রচার করুন।[1]

এভাবে সব প্রচেষ্টা নিষ্ফল বিনষ্ট হয়। মসজিদ নির্মাণের প্রতি তাদের বিদ্বেষের কারণ, তারা বিশ্বাস করে: যে রবকে চিনল ও তার বিধি-নিষেধ জানল সে স্বাধীন, তার উপর শরয়ী কোনো বিধান নেই। মসজিদের উপস্থিতি তাদের নিকট মূর্খতা, আমলে ত্রুটি, আল্লাহ ও তার আদেশ-নিষেধ না জানার আলামত। প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের রব সম্পর্কে সবচেয়ে বড় জাহিল।

কট্টর বাতেনিদের কুরাআন-হাদিসের বাহ্যিক অর্থ রহিত করার মূল উদ্দেশ্য এটাই। কট্টর সূফীরাও মনে করে, কেউ যদি ইয়াকিনের স্তরে উপনীত হয়, তার থেকে বিধি-বিধান উঠে যায়।

বর্তমান এখানে খ্রিস্টান মারুনী সম্প্রদায়, গ্রিক অর্থোডক্স, রোমীয় ক্যাথলিক ও মুসলিমদের বসবাস রয়েছে। সূত্র: ইউকিপিডিয়া। অনুবাদক।

[1] দেখুন: মারয়ি আল-কারমি রচিত: (الكواكب الدرية)(পৃ.৯৭ ও ১২৬), এবং ইব্‌ন আব্দুল হাদি রচিত: (العقود الدرية) (পৃ.১৯৭)

অনুবাদকের পরিশিষ্ট

হামার গণহত্যা

২-ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ই. হামা শহরে নুসাইরি [আলাবি] বংশের প্রেসিডেন্ট আসাদ ও তার সহোদর কর্নেল রিফাত আসাদের নেতৃত্বে সিরিয়ান সেনাবাহিনী আহলে-সুন্নাহ, বিশেষ করে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের উপর যে আক্রমণ ও গণহত্যা পরিচালনা করে নিকট অতীতে তার কোন নজির নেই। সে গণহত্যায় গুম, গ্রেফতার ও দেশত্যাগীদের ছাড়া শুধু হত্যার শিকার-ই প্রায় ৪০-হাজার সাধারণ লোক।

বিভিন্ন দেশের সংবাদ পত্রে প্রকাশ, সিরিয়ার আসাদ সরকার বিদ্রোহ ও আন্দোলন দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করে। পৈশাচিক এ দমন অভিযানের বিরুদ্ধে জাতিগত প্রতিবাদ ও বহির্বিশ্বের চাপ ঠেকানোর জন্য আন্তঃ ও বহিঃ যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়াসহ সংবাদ পত্রের উপর কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। হামা শহরের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সব রাস্তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। শহর থেকে কাউকে বের হতে দেয়া হয় নি। বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ কেটে দেয়া হয়, ফলে হামলার প্রথম দিন মঙ্গলবার রাতেই পুরো শহর বিভীষিকাময় অন্ধকারে পতিত হয়। বহু মসজিদ ও গির্জা

ধ্বংস করা হয়, অলিতে-গলিতে হত্যাযজ্ঞ চলে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, বহু কবরস্থান গুড়িয়ে দেয়া হয়। অবশেষে স্বৈরশাসক ও তার বাহিনীর হাতে [২-২৮ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ই.] লাগাতার ২৭-দিন অব্যাহত গণহত্যা ও বাড়ি-ঘর ধ্বংসের পর হামা শহরের এক তৃতীয়াংশ নিঃশেষ হলে এ ধ্বংস যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটে।

গণহত্যার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের বর্ণনা:

পরিকল্পনাকারী: প্রেসিডেন্ট হাফেজ আসাদ নুসাইরি, আলাবি।

বাস্তবায়নকারী: কমান্ডার রিফাত আসাদ, সিরিয়ান সেনাবাহিনী, সিরিয়ান এরাবিক এয়ার ফোর্স, সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা, পুলিশ বাহিনী, সাধারণ গোয়েন্দা বিভাগ, বুদ্ধিজীবী, সরকার দলীয় সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী, বিশেষ বাহিনী এবং সিরিয়ান সেনাবাহিনীর সবক'টি ইউনিটসহ পুরো সরকার যন্ত্র হামাবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হামলায় ব্যবহৃত অস্ত্র: সাজোয়াযান, ট্যাংক, কামান, রাইফেল, বিমান ও বুলডোজার।

ভিকটিম: সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী, তথা ইখওয়ানুল মুসলিমিন।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান মতে মৃত ও ধ্বংসের পরিমাণ:

- ব্রিটিশ সাংবাদিক ‘রবার্ট ফিসক’ বলেন, যিনি হামার গণহত্যার কয়েকদিন পরে সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন: মৃতদের সংখ্যা প্রায় ১০-হাজার।
- দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী: মৃতদের সংখ্যা প্রায় ২০-হাজার।
- কমান্ডার রিফাত আসাদ গর্ব করে বলেছে: আমরা সেখানে ৩৮-হাজার লোক হত্যা করেছি।
- ‘সিরিয়ার মানবাধিকার সংস্থা’ বলেছে: মৃতের সংখ্যা প্রায় ৩০-থেকে ৪০-হাজার। তাদের সবাই শহরবাসী। তাদের অধিকাংশকে যৌথভাবে ব্রাশ ফায়ার করে গণকবর দেয়া হয়।
- কতক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সেখানের মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা খুব কঠিন, কারণ ঘটনা শুরু থেকে ১০-১৫ হাজার শহরবাসী গুম ও গ্রেফতারের শিকার হয়, এখনো পর্যন্ত যাদের সম্পর্কে জানা যায়নি, তারা সেনাবাহিনীর কারাগারে জীবিত, না মৃত।

মৃত ও ক্ষতির ব্যাপ্তি:

- মৃতের সংখ্যা ১০-৪০ হাজার, যাদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা রয়েছে।
- অধিকন্তু ১৫-হাজার গুম ও গ্রেফতারের শিকার হয়েছে, যাদের সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।
- শহরের এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস হওয়ার কারণে প্রায় ১-লাখ লোক শহর ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়।
- হামার কয়েকটি এলাকা ধ্বংসের বেশী সম্মুখীন হয়েছে, বিশেষ করে ঐতিহ্যবাহী এ শহরের মধ্যাঞ্চল।
- সেনাবাহিনীর দমন পীড়নে ৮৮-টি মসজিদ, ৩-টি গির্জা এবং স্মৃতিবিজড়িত ও ঐতিহাসিক অনেক এলাকা ধ্বংস হয়।

হামার স্মৃতিচারণ:

“হামা”র গণহত্যা তার অধিবাসীদের এখনো কম্পিত করে, দীর্ঘ ৩০-বছর পর ২০১২ই. সনেও তারা সে বিভীষিকা ভুলতে পারে নি। সেই থেকে তারা সর্বদা সরকারের ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত জীবন পার করছে। সেখানে এমন কোনো পরিবার নেই, যার কোনো সদস্য হত্যা অথবা গুম অথবা দেশ ত্যাগে বাধ্য হয় নি।

এ গণহত্যার পরও সিরিয়ার সরকার সে এলাকাকে পরিত্যক্ত ও অবহেলিত রেখে দিয়েছে, সেখানে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের কোনো কর্মকাণ্ড নেই। এ ঘটনার বিভীষিকা এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হামার

অধিবাসীরা যখন কোনো ঘটনা বর্ণনা করে, তখন বলে এটা গণহত্যার পরের ঘটনা বা তার কিছু পূর্বের ঘটনা, জন্ম অথবা মৃত্যু; বিয়ে অথবা কোনো ঘটনায় তারা গণহত্যার কথা স্মরণ করে। সেই থেকে ২০১১ই. পর্যন্ত সিরিয়ায় সরকারের সমালোচনা করে কোন প্রতিবাদ সভা হতে দেখা যায় নি।

ঘটনার সূত্রপাত ও সমাপ্তি:

সিরিয়ার ক্ষমতাসীন সরকার হাফেয আল-আসাদের বংশ সিরিয়ায় সংখ্যালঘু, প্রায় ১২% পার্সেন্ট। ফ্রান্সের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও অস্ত্রের মুখে তারা সিরিয়ার ক্ষমতায় আসীন হয়। সেই থেকে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে সংখ্যাগুরু মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন করে আসছে তারা। ১৯৭১ই. হাফেয আল-আসাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর তার মাত্রা বেড়ে যায়। সিরিয়ায় শক্তিশালী মুসলিম সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তার সাথে জড়িতদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, কাউকে আজীবন কারাগারে বন্দি রাখা হয়। এরই প্রেক্ষাপটে হামাতে এক বিদ্রোহ ও আন্দোলন দেখা দেয়, যার সিংহভাগ নেতৃত্বে ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমিন। ২-ফ্রেব্রুয়ারি ঘটনার আগে তারা ‘হামা’ শহর তিনদিন নিজেদের দখলে রেখেছিল। তৃতীয় দিন পর ২-ফেব্রুয়ারি নুসাইরি সরকারের খড়্গ

নেমে পড়ে তাদের উপর, যার বর্ণনা উপরে দেয়া হল। সবাই প্রতিক্ষায় ছিল কিভাবে ও কখন শেষ হবে এ হত্যাযজ্ঞ! অবশেষে সরকারী বাহিনী ঘোষণা করল, জীবিতরা সবাই প্রেসিডেন্ট আসাদের ছবিসহ ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে রাজপথে মিছিল নিয়ে উপস্থিত হউক ও সরকারের পক্ষে শ্লোগান দিক। সেখানে সরকারী গণমাধ্যম ও টিভি ক্যামেরাগুলো তাদের ছবি তুলে ও প্রকাশ করে যে, হামায় সরকার বিরোধী কেউ নেই। এভাবেই হামার গণহত্যার সমাপ্তি হয়। [সূত্র উন্মুক্ত বিশ্বকোষ ইউকিপিডিয়া ও 'বিবিসি'র সংবাদ।]

ছয়দিন ব্যাপী আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৯৬৭ই. সনে ইসরাইল মিসরে হামলা করে সিনা উপত্যকা দখল করে নেয়, ফলে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যা ছয়দিন ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। সিরিয়া ও জর্ডানের চুক্তি ছিল, ফিলিস্তিনিদের সাহায্যে জর্ডান ও সিরিয়া ইসরাইলের উপর একযোগে আক্রমণ করবে। নির্দিষ্ট সময়ে জর্ডান হামলা করেছে ঠিক, কিন্তু সিরিয়ার সেনাপ্রধান ফিলিস্তিনিদের সাহায্য থেকে বিরত থাকে। ফলশ্রুতি মিসর, জর্ডান ও সিরিয়ার পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধে ইসরাইল মার্কিন সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিশরের সিনাই মরুভূমি, সিরিয়ার

গোলান মালভূমি, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর, বায়তুল মোকাদ্দাসের পূর্বাংশ এবং গাজা উপত্যকা দখল করে নেয়। তখন সিরিয়ার সেনাবাহিনী প্রধান ছিল বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশশার এর পিতা হাফেয আল-আসাদ। হাফেয আল-আসাদ তার বাহিনীকে হামলায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে এবং সিরিয়ার উঁচু ভূখণ্ড গোলান মালভূমি, যা যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ, ইসরাইলের হাতে তুলে দেয়। সেখান থেকে সিরিয়ার সৈন্য বাহিনী সরিয়ে আনে, অতঃপর সংবাদপত্রে মিথ্যা প্রচার করে যে, ইসরাইল গোলান মালভূমি দখল করে নিয়েছে, অথচ তখনো ইসরাইল বাহিনী সেখানে পৌঁছায় নি। তখন সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী সালাহ জাদিদ তার ভূমিকার সমালোচনা করেন। এভাবে হাফেয আল-আসাদ জর্ডানের সাথে গাদ্দারি করে ইসরাইলের হাতে নিজ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমি তুলে দেয়। এ ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী সালাহ জাদিদ ও সেনা বাহিনী প্রধান হাফেয আল-আসাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়। সালাহ জাদিদ জরুরি বৈঠক ডেকে তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু হাফেজ আল-আসাদ সেনাবাহিনীতে থাকা তার ঘনিষ্ঠ সাথীদের নিয়ে নুরুদ্দিন আতাসি ও সালাহ জাদিদকে[1] ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে জেলে বন্দি করে। উল্লেখ্য

[1] প্রেসিডেন্ট "নুরুদ্দিন আতাসি" ও প্রধান মন্ত্রী "সালাহ জাদিদ" উভয়ের মেয়াদকাল ২৫ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ই.-- ১৮নবেম্বর, ১৯৭০ই.।

সালাহ জাদিদ-ই তাকে বন্ধুত্বের খাতিরে সচিবালয় থেকে সেনাবাহিনীতে নিয়ে আসেন। এখানে নুসাইরি বংশদ্ভুদ হাফেজ আল-আসাদ বংশের মুসলিম বিদ্বেষ ও গাদ্দারি স্পষ্ট হয়। [সূত্র উন্মুক্ত বিশ্বকোষ ইউকিপিডিয়া।]

[সম্পাদকের কথা]

বর্তমান কালে সিরিয়ায় যে যুদ্ধ চলছে তাও নুসাইরী (তথাকথিত আলাবী) ও আহলে সুন্নাতের মধ্যকার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ইরান শিয়া হওয়ার কারণে তার মিত্র বাশশারের পক্ষ নিয়ে তাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করছে। এ পর্যন্ত বাশশার প্রায় ৬০ লাখ লোককে হত্যা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে যাবতীয় অস্ত্র ব্যবহার করছে। এমনকি নিষিদ্ধ ঘোষিত অস্ত্রগুলোও ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের হাত থেকে আবাল-বৃদ্ধ বনিতা কেউই রেহাই পাচ্ছে না। তাদের দ্বারা মসজিদ, গীর্জা সবই ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। মানবিকতা যেন বর্তমান সিরীয় সেনাবাহিনীর কাছে অপরিচিত জিনিস।

এমতাবস্থায়, আসূন আমরা সবাই মিলে দো'আ করি, আল্লাহ যেন আমাদের সুন্নী ভাইদেরকে যারা এ অত্যাচারি শাসকের বিরুদ্ধে জীবন-পণ করে লড়ছে এবং শহীদ হচ্ছে, তাদেরকে রহমত

করুন, তাদের প্রতি সাহায্য নাযিল করুন। আমীন।! আর আমাদের উচিত তাদেরকে সার্বিক সাহায্য করা। [সম্পাদক]

সমাপ্ত